

'Nurturing Eeman in Children' গ্রন্থের অনুবাদ



শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা

ড. আইশা হামদান

সম্পদ

শিশুমানে
ঈমানের
পরিচর্যা

শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা

ড. আইশা হামদান ﷺ

মহাপ্রকাশ
প্রকাশন



শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৯

ISBN : 978-984-8041-45-1

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, আল ফুরকান শপ

একমাত্র পরিবেশক: ইতি প্রকাশন

মূল্য : ৩০০ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯

facebook.com/somorponprokashon

অনুবাদক : আবু আবদুল্লাহ

সম্পাদক : সাজিদ ইসলাম

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

শারঈ সম্পাদক : হাফিজ আল মুনাদি

সূচিপত্র

আলোচ্য বইয়ের উপর লেখিকার সাক্ষাৎকার.....	১১
ভূমিকা	১০

পর্ব এক

শিশুর ঈমান পরিচর্যার ভিত্তি

অধ্যায় এক : আকীদা, ঈমান এবং ইহসান	২৬
আকীদা শব্দের অর্থ.....	২৬
ইসলামি আকীদার গুরুত্ব.....	২৭
আকীদা এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক.....	২৮
ঈমান এবং মুমিন-এর অর্থ.....	২৮
অন্তরে বিশ্বাস	৩১
মুখে স্বীকৃতি প্রদান.....	৩১
আমলে বাস্তবায়ন.....	৩২
ইহসান এর অর্থ.....	৩২
সন্তান প্রতিপালনের সাথে ঈমান, আকীদা, ইহসানের সম্পর্ক কী?	৩৩
অধ্যায় দুই : সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বশীলতা অনুধাবন	৩৭
দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা	৩৮
সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা.....	৩৯
সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার ও আনন্দ	৪২
সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ.....	৪৩
লুকমান হাকীম-এর ঘটনা.....	৪৩
অধ্যায় তিন : সন্তান প্রতিপালনের বুনিয়াদি বিষয়সমূহ.....	৪৮
বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব.....	৪৮
বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি.....	৪৯

বিয়ে এবং সন্তান প্রতিপালন.....	৫১
নারী-পুরুষের সুনির্দিষ্ট ও পৃথক ভূমিকাসমূহ পালন করা	৫১
মাতৃত্বের সুমহান ভূমিকা.....	৫৩
নারীর কর্মক্ষেত্র	৫৪
পিতৃত্বের ভূমিকা	৫৫
নিজের ঈমান বিকশিত করা.....	৫৬
সন্তানের মৌলিক অধিকার (পিতা-মাতার দায়িত্ব)	৫৭
পিতা-মাতার মৌলিক অধিকার (সন্তানের দায়িত্ব)	৫৮
শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর গুরুত্ব, শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ .	৫৯
শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ.....	৬০
নেক সন্তানের জন্য দুআ করা.....	৬১
অধ্যায় চার : ইলম ও শিক্ষালাভ	৬৩
ইলমের গুরুত্ব.....	৬৩
ইলম-এর অর্থ কী?	৬৫
ইলম এবং পিতা-মাতার ভূমিকা	৬৬
ইলম এবং সন্তান প্রতিপালন	৬৭
ইলম অর্জনের থেকেও বেশি কিছু.....	৬৮
আরবি ভাষা শিক্ষা করা	৬৯
রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদ্ধতিতে গুণার্জন ও শিক্ষাদান	৭১
দৃশ্যমান উপমা প্রদান করা	৭২
ঘটনা বর্ণনা করা	৭২
কসম করা	৭৩
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ধীরে ধীরে শিখানো	৭৩
বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা	৭৩
মানুষের সহজাত প্রকৃতির দিকে মনোযোগ প্রদান করা	৭৪
অধ্যায় পাঁচ : ফিতরাত—শিশুদের সহজাত প্রকৃতি.....	৭৫
ফিতরাত কী?	৭৬
তাওহীদের চুক্তি স্বাক্ষরিত আছে প্রতিটি মানব-প্রাণে.....	৭৬
শিশুমনে পিতা-মাতার প্রভাব.....	৭৭
শিশুমনে শয়তানের প্রভাব.....	৭৯
শিশুর ফিতরাত (সহজাত প্রকৃতি) রক্ষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব	৭৯

পর্ব দুই

ঈমানের রকনসমূহের সাথে শিশুকে সংযুক্ত করা

অধ্যায় ছয় : আল্লাহ—যিনি উচ্চ, যিনি শক্তিমান.....	৮২
আল্লাহর উপর ঈমান	৮২
আল্লাহর সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন.....	৮৫
শিশুকে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব শেখান.....	৮৯
শিশুকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখান.....	৯১
অধ্যায় সাত : ফেরেশতাদের কথা.....	৯৫
ফেরেশতাদের উপর ঈমান	৯৫
ফেরেশতাদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন.....	৯৭
অধ্যায় আট : নবি-রাসূলদের কথা.....	১০৮
নবি-রাসূলদের উপর ঈমান	১০৮
নবি-রাসূলদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন.....	১১২
অধ্যায় নয় : আসমানি কিতাব এবং ওহি.....	১১৭
আসমানি কিতাব এবং ওহির উপর ঈমান.....	১১৭
ওহির সাথে শিশুদের সংযুক্ত করা	১২১
অধ্যায় দশ : বিচার-দিবস এবং আখিরাতের জীবন	১২৬
বিচার-দিবস এবং আখিরাতের উপর ঈমান.....	১২৬
বিচার-দিবস এবং আখিরাতের সাথে শিশুদের সংযুক্ত করা	১৩১
মৃত্যুর বাস্তবতা থেকে শিশুকে আখিরাতের শিক্ষা দেওয়া	১৩৪
দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা	১৩৬
দুনিয়ার বাস্তবতা	১৩৮
অধ্যায় এগারো : তাকদীর	১৪১
তাকদীরের উপর ঈমান.....	১৪১
শিশুদেরকে তাকদীরের ইলম দান করা	১৪৪
তাকদীরের উপর ঈমানের কিছু উপকারিতা.....	১৪৯

পর্ব তিন

শিশুর মনে ইসলামি ব্যক্তিত্ববোধ তৈরি করা

অধ্যায় বারো : ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিকাশের কিছু সূত্র	১৫১
ব্যক্তিত্ব (PERSONALITY)	১৫১
পরিচিতি (IDENTITY)	১৫১
শুরু থেকে শুরু করুন!	১৫১
শিশু যেন সবকিছু ইসলামের চোখে দেখতে শিখে	১৫৪
শিশুকে আনুগত্যের গুরুত্ব শেখাতে হবে	১৫৫
পরিবারের মধ্যে আনুগত্যের চর্চা	১৫৬
শিশুমনে নৈতিকতার বিকাশ ও প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি	১৫৮
শিশুদেরকে উত্তম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা-প্রদান করা	১৫৯
শিশুর জন্য পিতা-মাতাকেই উত্তম আদর্শ হতে হবে	১৬১
মুসলিম হওয়া গর্ব ও সম্মানের বিষয়	১৬১
জিহাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি	১৬২
শিশুদেরকে ইসলামের বীরযোদ্ধা, জিহাদ ও বিজয়ের গল্প বলুন	১৬৫
নৃতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের পূর্বে ইসলাম	১৬৫
অধ্যায় তেরো : শিশুমনে ইসলামি ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি	১৬৭
সংজ্ঞা : আত্ম-সচেতনতা (SELF-CONCEPT) ও আত্মমর্যাদা	১৬৭
আত্মমর্যাদার গুরুত্ব	১৬৭
আত্মমর্যাদাবোধ তৈরির কিছু উপায়	১৬৮
আল্লাহ-প্রদত্ত উপহারগুলোর পরিচর্যা করুন	১৬৮
আপনার শিশুকে ভালোবাসুন	১৬৮
আপনার শিশুকে সঙ্গ দিন	১৭০
শিশুর উত্তম আচরণের প্রশংসা করুন	১৭১
প্রকাশ্যে শিশুর প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদান	১৭১
শিশুকে অপমান করবেন না, লজ্জা দিবেন না	১৭২
শিশুদের সাথে পরামর্শ করুন এবং তাদের মতামত জানুন	১৭৩
দায়িত্বশীলতার বিকাশ ও স্বাধীনতা প্রদান	১৭৪

পৰ্চ চার

পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া

অধ্যায় চৌদ্দো : ঘরের পরিবেশ—আগে ঘর, তবে তো পর	১৭৬
বাড়িতে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করুন	১৭৬
বাড়িতে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন	১৭৭
শিক্ষাদান ও গ্রহণ একটি চলমান প্রক্রিয়া	১৭৯
বাড়িতে একটি ইসলামি লাইব্রেরি তৈরি করুন	১৭৯
শিশুদের গৃহ-সম্পর্কিত দুআ এবং ইসলামি নিয়মকানুন শিক্ষা দিন	১৮০
নেককার ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো	১৮২
ঘর থেকে নেতিবাচক প্রভাবগুলো দূর করুন	১৮৩
টেলিভিশন	১৮৩
গান-বাজনা হারাম	১৮৩
ছবি, মূর্তি এবং কুকুর	১৮৪
দীন পালনে বাড়ির নির্মাণ-কাঠামোর ভূমিকা	১৮৫
বাড়িতে টেলিভিশন রাখা সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা	১৮৫
বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের পথে বিপত্তি	১৮৬
টেলিভিশন দেখা আধ্যাত্মিক ক্ষতি	১৮৭
অধ্যায় পনেরো : শিশুর সাথীদের প্রভাব	১৯০
সাথীদের ভূমিকা	১৯০
ভালো বন্ধু নির্বাচন	১৯১
আল্লাহকে ভালোবাসার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব	১৯৪
অধ্যায় ষোলো : সামাজিক পরিবেশ	১৯৬
শিশুকে মুসলিম-জাতির সাথে সংযুক্ত করুন	১৯৭
‘সামষ্টিক সচেতনতা’ তৈরিতে কিছু ব্যবহারিক উপদেশ	১৯৭
শেষ কথা	১৯৮
লেখিকার পরিচিতি	২০০
রেফারেন্স	২০৪
প্যারেন্টিং সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করতে চাইলে	২০৬
অভিমত	২০৮
একনজরে ইসলামি পরিভাষা	২০৯

আলোচ্য বইয়ের উপর লেখিকার সাক্ষাৎকার

১. প্যারেন্টিং (সন্তান-প্রতিপালন) নিয়ে লেখার অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে হতে কেন ‘ঈমানের পরিচর্যা’কে আপনার বইয়ের প্রধান ফোকাস হিসেবে নির্বাচন করলেন?

- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আমি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্তান প্রতিপালন-এর উপরে রচিত বিভিন্ন বই পড়েছি। অধিকাংশ বইয়ের বিষয়বস্তু ও আলোচনা একই ধরনের। বইগুলোতে প্রাথমিকভাবে ইসলামের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, কিছু একটা অনুপস্থিত, আর সেটা হলো মানুষের মনোজগৎ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা—ঈমান ও ইখলাসের আলোচনা। মুসলিম সংখ্যা-প্রধান দেশে আমি অনেক বছর ধরে বসবাস করছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতে এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা করা হয় না। হ্যাঁ, কীভাবে তারা সালাত আদায় করবে, সিয়াম পালন করবে, দুআ করবে ইত্যাদি সন্তানদের শেখানো হয়, কিন্তু ইখলাস, ঈমান ইত্যাদি বিষয়গুলোতে জোর দেওয়া হয় না। ফলে আমি অনুভব করেছি, আমাদের স্কুল-মাদরাসা এবং পরিবারগুলোতে সন্তানের ঈমানের যত্ন ও বিকাশ ঘটানোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। নিছক সাগরের ফেনার মতো মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটিয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রতি—যারা হবে সত্যিকারের মুমিন।

২. আপনার বইয়ের ভূমিকাতে আপনি উল্লেখ করেছেন, সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর করার জন্য ইসলামি মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জরুরি। পাঠকদের জন্য এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলবেন কি? কোন কোন সামাজিক ব্যাধির মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে? ঈমানের মাধ্যমে কীভাবে এগুলোর প্রতিকার করা সম্ভব? পিতা-মাতা হিসেবে আমরা শিশুদেরকে কীভাবে এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারি?

- মুসলিমদের অবস্থা হবে সাগরের ফেনার মতো, এর মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহ -এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছি। নবিজি বলেছেন, ‘শীঘ্রই বিভিন্ন জাতির লোকেরা

তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পরস্পরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করে।’ জিজ্ঞেস করা হলো ‘তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?’ তিনি বললেন, ‘না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত, কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এবং আল্লাহ শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহান ঢুকিয়ে দিবেন।’ জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আল-ওয়াহান কী?’ তিনি বললেন, ‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।’^[১]

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর প্রধান রোগ হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা! দুনিয়ার মোহে পড়ে মুসলিমরা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দিচ্ছে। পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসতে পারে। যখন তাদের অন্তরে এই ভালোবাসা এবং ঈমান থাকবে, তখন অন্যান্য সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে আনুগত্য অর্জিত হয়। মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে যে-শক্তি অর্জন করে সেই শক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার সকল পরীক্ষা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে। আর মুমিনের পরীক্ষাগুলো দৈনন্দিন জীবনে একের-পর-এক আসতেই থাকে।

৩. দুনিয়াবি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিপরীতে ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রাধান্য সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন।

-আপনার প্রশ্নের জবাব আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমেও দেওয়া যায়। আপনি নিজে কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিবেন এবং কোন বিষয় অর্জনে অধিক প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন? এমন কিছুকে প্রাধান্য দিবেন যা হয়তো গড়ে সত্তর বছর টিকবে নাকি এমন কিছুকে প্রাধান্য দিবেন যা অনন্তকাল টিকে থাকবে? আমার শব্দ নির্বাচন লক্ষ্য করলে দেখবেন আখিরাতের ক্ষেত্রে আমি বলেছি ‘অনন্তকাল’ এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে বলেছি ‘হয়তো’। কারণ এই দুনিয়ার জীবনে কোনো কিছুর নিশ্চয়তা নেই। আগামীকাল আমরা এখানে থাকব কি না, কেউ বলতে পারি না। কাজেই দ্বিতীয় প্রশ্ন হওয়া উচিত, অনিশ্চিত বিষয়ের থেকে সুনিশ্চিত বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় কি?

যদি এতটুকু কেউ বোঝে তা হলে সে আরও বুঝতে পারবে যে তার পরিবারের প্রধান-লক্ষ্য হওয়া উচিত আখিরাতের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন করা। এই লক্ষ্য তো প্রত্যেক মুসলিমের থাকা উচিত।

আমি এ কথা বলছি না যে দুনিয়াবি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো গুরুত্ব নেই, বরং সঠিক নিয়ত থাকলে সেগুলো অর্জন করার মাধ্যমেও আল্লাহর ইবাদাত করা যায়, সাওয়াব

[১] আবু দাউদ : ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৭৮; সহীহ

লাভ করা যায়। বিপদ ঘটে তখনই যখন এগুলো শেখার পেছনে সঠিক নিয়ত থাকে না, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বা দীন ইসলামের খেদমতের জন্য সেগুলো শেখা হয় না। কিংবা যখন দুনিয়ার শিক্ষাটা হয় হারাম পদ্ধতিতে, হারাম বিষয়ের উপর। এরপর সেগুলোকে নানা রকম অদ্ভুত উপায়ে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সর্বাবস্থায় আমাদের আল্লাহকে স্মরণ রাখা উচিত, তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আমার সন্তান যেন প্রথমে সঠিক ও মজবুত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে। এটা নিশ্চিত করার পর অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. ঈমান মজবুত করা তো বেশ কঠিন বিষয়! এমন কি বড়রাও এতে হিমশিম খেয়ে যায়! শিশুদের ঈমান মজবুত করতে এবং ঈমানের রুকনসমূহের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করতে আপনি কী উপদেশ দিতে চান?

- যদিও এ প্রসঙ্গে আমার বইতে বিভিন্ন উদাহরণ এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, এরপরেও আমি বলব ঈমানকে মজবুত করার জন্য দুটি প্রধান চাবিকাঠি রয়েছে। প্রথম চাবিকাঠি হলো ইলম অর্জন করা। এ কারণে আমার বইয়ের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রয়েছে ইলম অর্জন প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইলম অর্জনের সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত। ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ইলম থাকলে আপনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে ও বুঝতে পারবেন, অথচ অধিকাংশ মানুষের সেই যোগ্যতা নেই। ইলমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে শুধুমাত্র ঈমানই মজবুত হয় না, ইয়াকীন অর্জনের পথও সুগম হয়ে যায়। এগুলো বলে বোঝানো কঠিন।

যখন কেউ ইসলামের ব্যাপকতা, পরিপূর্ণতা এবং নিখুঁত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে এবং আল্লাহ তার সৃষ্টি জগতের উপর কী পরিকল্পনা রেখেছেন তা বুঝতে পারে—তখন সে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ঈমান এবং ইসলামকে দৈনন্দিন সকল কাজের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা। আমার বইতে এই বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদা তিনি আমাদেরকে দেখছেন। এই দুনিয়ার সর্বত্র তিনি নিদর্শন উপস্থাপন করে রেখেছেন। এগুলো সবার সামনেই রয়েছে, কিন্তু আমরা খেয়াল করি না, শিক্ষা গ্রহণ করি না। ফলে কোনো উপকারও লাভ করতে পারি না।

অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রমাণিত হচ্ছে তিনিই একমাত্র সত্যিকারের ইলাহ। তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। আমাদের সকল ঘটনায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি সবকিছুর উপরে প্রভাব রাখেন। এগুলো আমরা যত জানব

তত বুঝতে পারব, আর সে অনুসারে তাফাকুর-তাদাক্বুর (চিন্তা ও গবেষণা) করতে পারব। যখন নিজেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করব তখন সন্তানদের সাথেও শেয়ার করতে পারব। এভাবে দৈনিক অনেক সুযোগ আসবে যার মাধ্যমে সন্তানদের ইমানের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটতে পারব।

৫. মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে বলুন, যদি শিশুদের সামনে কোনো শক্তিশালী মুসলিম রোল মডেল না থাকে তা হলে তাদের ইমানের উপর কী প্রভাব পড়ে? আর যদি শিশুদের সামনে তার পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ শক্তিশালী রোল মডেল (অনুকরণীয় আদর্শ) হয়, তা হলে তার উপর কতটুকু প্রভাব পড়ে?

-পরিবারে কোনো শক্তিশালী 'রোল মডেল' ছাড়াও ইমানের বিকাশ ঘটানো সম্ভব, কিন্তু রোল মডেল থাকলে তা বেশি কার্যকর ও প্রভাবশালী হয়। পিতা-মাতাকেই সেই রোল মডেল হতে হবে এটা জরুরি নয়, তবে প্যারেন্টিং এমন একটি দায়িত্ব যেখানে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিতা-মাতা অনেক সময় ও সুযোগ পেয়ে থাকেন যা অন্য কেউ পায় না। পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে অনেক সময় একত্রে কাটায়। আমার বইতে আমি আলোচনা করেছি শিশুরা দেখে দেখে নতুন বিষয় শিখে। আশেপাশের মানুষদের আচরণ নকল করার মাধ্যমেও শিশুরা শিখে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ বিষয়টিকে বলে অবজারভেশনাল লার্নিং বা মডেলিং (observational learning or modeling)। শিশুর আচরণে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

বাস্তবে আমাদের সামনে তো শক্তিশালী রোল মডেল রয়েছেই। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁর শিক্ষাগুলো এমন জীবন্তভাবে সংরক্ষিত যেন তিনি আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। যখন কেউ হাদীস পড়বে, সীরাত পড়বে, সাহাবীদের ঘটনাগুলো জানবে তখন তার কাছে মনে হবে যেন তারা কাগজের পৃষ্ঠা ছিড়ে জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। সেই ঘটনাগুলো এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত আছে যেন একজন ব্যক্তি নিজের চোখের সামনে সেই রোল মডেলদেরকে দেখতে পায়। তাদেরকে 'অনুভব' করতে পারে। এটা ইসলামের একটি আশ্চর্যজনক বিষয় যে এত সূক্ষ্মভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামদের ঘটনাগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। চৌদ্দশত বছর পরেও এসব রোল মডেল থেকেই আমরা সকল উপকার লাভ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আধ্যাত্মিক রোল মডেল এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

৬. আপনার বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে আপনি লিখেছেন, শিশুদের ফিতরাত (যে সহজাত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শিশুরা আল্লাহকে চিনতে পারে) পিতা-মাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নিয়ামাত। ব্যাখ্যা করে বলবেন কি, শিশুদের ফিতরাত কীভাবে পিতা-মাতার জন্য একটি নিয়ামাত? এই নিয়ামাতকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমরা শিশুদেরকে (ইমান) শিক্ষা প্রদান করতে পারি?

- এই বিষয়টি আমার বইয়ের উক্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবে আপনার প্রশ্নের খাতিরে আমি এখানে একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। ধরুন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেডিসিন-শাস্ত্রকে খুব ভালোবাসে এবং সে চিকিৎসক হতে চায়। বায়োলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তার খুব আগ্রহ, এসব সাবজেক্টই তার কাছে সহজ লাগে। এই ছাত্রটি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে এবং মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবে তখন তার কাছে এটা খুবই সহজ এবং আনন্দদায়ক মনে হবে। সেই একই ছাত্রকে যদি জোর করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠানো হয় তবে সেটা তার জন্য খুবই কষ্টকর অভিজ্ঞতা হবে। বিষয়টি তার কাছে কঠিন মনে হবে এবং হয়তো সে ক্লাস ফাঁকি দিতে শুরু করবে।

অনুরূপভাবে, ফিতরাত হলো আমাদের জন্মগত সহজাত বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে আল্লাহর উপর আমরা ঈমান আনি এবং এককভাবে তার ইবাদাত করি। এটি পিতা-মাতার উপরে এক বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা, এই বৈশিষ্ট্যের কারণে শিশুদেরকে (ঈমান) শেখানো খুব সহজ, ঠিক যেভাবে একজন মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে মেডিসিন অধ্যয়ন করা অন্য বিষয় থেকে সহজ। শিশুদেরকে ফিতরাতের বিপরীত কিছু শেখানোই বরং কঠিন কাজ। কাজেই এই নিয়ামাতকে কাজে লাগিয়ে আমরা দুইভাবে শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে পারি।

এক, শৈশব থেকেই শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করা। শিশুরা জন্ম থেকেই শিখতে শুরু করে এবং তখন তাদের ফিতরাত সবচেয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। দুই, তাওহীদের উপর মনোযোগ প্রদান করা এবং ঈমানের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেওয়া যেভাবে সেগুলো কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমান যুগের মুসলিমরা তাওহীদের গুরুত্ব ভুলে গেছে। তারা নানা রকমের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও বিধর্মীদের চিন্তা চেতনা দ্বারা পথভ্রষ্টতায় পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের উচিত তাওহীদের গুরুত্ব পুনর্জাগরণ করা, শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য নয় বরং আখিরাতকে সামনে রেখে এর পুনর্জাগরণ করতে হবে। কেননা, একমাত্র তাওহীদের মাধ্যমেই জ্ঞানাতের গেট খুলবে।

৭. বর্তমান দুনিয়ায় নানাভাবে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ‘সবখানে ধর্ম টেনে আনবে না’ (compartmentalization of beliefs)। তুমি সালাত আদায় করো ঠিক আছে, কিন্তু কাজের সময় নয় বা স্কুলে নয়। তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো ঠিক আছে, কিন্তু সবখানে নিজের ধর্ম বিশ্বাসের কথা বলবে না। কীভাবে আমরা এসব চিন্তাধারার মোকাবিলা করতে পারি? কেননা এই পরিবেশেই তো শিশুদেরকে ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

-এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমরা কাফিরদের ফাঁদে ধরা দিয়েছে। দ্বীন থেকে দুনিয়া পৃথক করা তাদের সেকুলার পদ্ধতি। এটিও দুনিয়াকে ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত যা নিয়ে শুরুতে আমি কথা বলেছি। আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে ইসলাম

নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং এটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। এমনভাবে ইসলামকে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে দৈনন্দিন ছোটখাটো বিষয়েও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রত্যেকটি নিয়ত যেন শারীআ মোতাবেক আল্লাহর জন্য হয়। তা হলে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ পরিণত হবে ইবাদাতে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হবে। অন্যথায় আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করব। সামাজিক চাপ, বন্ধু-বান্ধবদের চাপ, অন্যের কাছে জাজমেন্টেড হওয়া অথবা কে কী বলল ইত্যাদি বিষয়ের উপর আত্মসমর্পণ করে দীন পালনে সংকোচ বোধ করব। কিন্তু আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং অন্য সবার থেকে তাকেই বেশি ভয় করতে হবে।

৮. আজকাল নারীদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়। মানুষ চায় নারীরা একসাথে সবকিছু সামলাবে। যেমন : বিয়ে, পরিবার, সন্তান, ক্যারিয়ার, সমাজসেবা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি সামলে নিয়ে 'সেরা মা'-এর ভূমিকাতে তাদেরকে আবির্ভূত হতে হবে। নারীদের প্রতি এই ধরনের মানসিকতার কারণে মুসলিম পরিবারগুলো কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? যে মা এতকিছু সামলাতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে তার সন্তানের মনোজগতে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে?

-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করার সুবাদে আমি দেখেছি কীভাবে মেয়েদের কাছ থেকে একসাথে এতকিছু প্রত্যাশা করা হয়। তাদেরকে একইসাথে উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করতে হয়, আবার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। তাদের অনেকেই 'ক্যারিয়ার গোল' অর্জন করার চাপে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে দেরি করে এবং পরিবার গঠন করতে পারে না। আমি অনেক নারী শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং করেছি যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায় না কিংবা তাদের সেই সামর্থ্য নেই, অথচ পিতা-মাতার চাপে কিংবা সামাজিক চাপে বাধ্য হয়ে তাদেরকে পড়ালেখা করতে হচ্ছে। তারা প্রচুর মানসিক চাপের শিকার হয় এবং উদ্বেগতা, বিষণ্ণতা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যায়। এ বিষয়টি মুসলিম বিশ্বেও ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং এক্ষেত্রেও আমরা অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ করছি, অথচ মাতৃত্বের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার কারণে অমুসলিমদের পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমি বিশ্বাস করি মুসলিম পরিবারগুলোতে ইতোমধ্যে এর মারাত্মক প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের উপরে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। যখনই মানুষ আল্লাহর নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই সূক্ষ্ম ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সবশেষে তারা নিজেরাই ভুক্তভোগী হয়েছে।

মেয়েদের জন্য মাতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্মানিত একটি কাজ। পরিবার ও সমাজের সঠিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাতৃত্বের ভূমিকার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য মায়ের কোনো বিকল্প নেই। সারা দুনিয়ার সব মানুষদের থেকে তাদের কাছে

মা বেশি মূল্যবান। অন্য কারও মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করা যায় না।

আমাদের সন্তানদের প্রতি, মেয়েদের প্রতি এই বার্তাটি বিশেষভাবে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরি যে, তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা মাতৃত্বকে একটি লাইফ টাইম (জীবনব্যাপী) ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। বাড়ির বাইরে কাজ করা মেয়েদের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, আমি এ কথা বলছি না। কেননা, আমাদের মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষক, নারী ডাক্তার ইত্যাদি পেশাজীবীদের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই বিষয়ে (সামাজিক বনাম পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ করা) ক্রমধারা বজায় রেখে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে আমি একটি পৃথক গ্রন্থ লিখছি, কারণ এটি বর্তমান সময়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। (কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

৯. বর্তমান বিশ্বে যেভাবে মুসলিমদেরকে নজরদারী করা হয় এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা হয়, এই পরিবেশে সন্তানদের মধ্যে কীভাবে একটি ইতিবাচক সেলফ-ইমেজ (আত্ম-পরিচয়) বিকাশে উৎসাহিত করতে পারি এবং কীভাবে ইসলামি পরিচিতিতে আঁকড়ে ধরতে তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারি?

-যখন শিশুদের ঈমান শক্তিশালী হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে ও ইসলামিক আইডেন্টিটিকে তারা আঁকড়ে ধরবে। এ বিষয়গুলো ঈমানের সাথে যুক্ত। এ কারণে বর্তমান সময়ের শিশুদের ঈমানের বিকাশ ঘটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চারদিকে ইসলামকে কলুষিত করে উপস্থাপনের জন্য এত এত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যে, এই কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে হবে। সম্প্রতি আমি নারীদের মানসিক-স্বাস্থ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে স্পেন গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি এ ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি দেখেছি মুসলিমদের প্রতি অন্য মানুষেরা কত নেতিবাচক ও বিদ্বেষমূলক মানসিকতা রাখে।

তাদের আচরণের কারণে অনেক সময় মনে হয় যেন জমাটবাঁধা বরফ দিয়ে অন্তরকে চেপে ধরা হয়েছে। কিন্তু ইয়াকীনের (সুদৃঢ় ঈমান) মাধ্যমে সহজেই সেই হিমশীতল বরফকে গলানো যায় এবং অন্তরে তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করা যায়।

আপনি সত্যের পথে রয়েছেন। তারা যাই বলুক না কেন কিংবা যাই করুক না কেন— তারা কখনও সেই সত্যকে আপনার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই অনুভূতির মাধ্যমে অন্তরে তৃপ্তি লাভ করা যায়। আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হোন না কেন, দুনিয়াবি স্বার্থে কখনও নিজের বিশ্বাসে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে নবিজি ﷺ-এর একটি হাদীস মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন, ‘ইসলামের শুরু অপরিচিত অবস্থায় এবং শীঘ্রই

তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। কাজেই সেই অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ!।^[১] প্রমাণ করা হলো, 'কারা সেই অপরিচিত (গুরাবা), ইয়া রাসূলুল্লাহ?' তিনি জবাব দিলেন, 'মানুষ কলুষিত হয়ে যাবার পর, যারা তাদেরকে সংশোধন করতে থাকে।' আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'লোকেরা সুন্নাহ বিকৃত করার পর, যারা আমার সুন্নাহকে সংশোধন করবে।' আরেকটি বর্ণনা অনুসারে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, '(তারা) কলুষিত সমাজে বসবাসকারী অল্পসংখ্যক সংলোক। তারা সমাজের প্রচলিত রীতি-বিরোধী।'^[২]

সুতরাং সারকথা হলো, আমাদের খুশি হওয়া উচিত, গর্ব অনুভব করা উচিত যে আমরা সেই গুরাবা—যাদেরকে নবিজি সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তারা সুন্নাহ অনুসরণ করে এবং মানুষদেরকে ইসলামের দিকে ডাকে।

১০. শিশুদের ঈমান বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন, ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা এবং মায়া-মমতার কি সম্পর্ক রয়েছে?

- আমি বিশ্বাস করি এই বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে খুবই জরুরি। আমার মনে পড়ে, যখন আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাস করতাম তখন আমাকে শিখানো হয়েছিল, **শাসন করা তখনই কাজ করবে যখন পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে একটি মজবুত পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে।** যদি পারস্পরিক সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা না থাকে তা হলে যতই শাসন করা হোক না কেন— শিশুদের আচরণকে পরিবর্তন করা যায় না—শাসনের কোনো প্রভাবও দেখা যায় না। আমি বিশ্বাস করি শিশুদের ঈমান বিকাশের ক্ষেত্রে একই মূলনীতি কাজ করে। যদি আমরা শিশুদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও সুসম্পর্ক তৈরি করতে সময় না দিই তা হলে আমাদের অন্যান্য প্রচেষ্টা খুব একটা সফলতার মুখ দেখবে না। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় মায়া-মমতা, ভালোবাসা, একত্রে সময় কাটানো, মজা-করা, দুঃখের বিষয় ভাগাভাগি করা ইত্যাদির মাধ্যমে। এভাবে যখন একটি বন্ধন তৈরি হয়ে যায়, তখন শিশুরা অনেক বেশি ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এর জন্য অনেক সাধনা ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

১১. শিশুদের ঈমান বিকাশের চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ঈমান কীভাবে বিকশিত হতে পারে?

-এ বিষয়টি আমি আমার বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, সন্তান পরিচর্যার দায়িত্বের মাধ্যমে সহজাতভাবেই আমাদের ঈমান বিকশিত হয়। শিশুদের সাথে সাথে আমরাও শিখতে থাকি ও বড় হতে থাকি। যখন আমরা শিশুদেরকে কোনো কিছু শিখাতে চাই এবং তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে চাই,

তখন সবচেয়ে কার্যকরী ফল অর্জনের জন্য নিজেদের ঈমান বিকশিত করা এবং নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে যায়। এটা সন্তান প্রতিপালনের একটি অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১২. এবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। আপনার কাছে জানতে চাই, মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আপনার ঈমান কীভাবে বিকশিত হয়েছে?

- সন্তান প্রতিপালন কোনো সহজ কাজ নয়। এর মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে কিন্তু আমি অনুভব করেছি প্যারেন্টিং-এর মাধ্যমে আমার নিজের ঈমানের উন্নতি এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি সকল কঠিন অবস্থাতেই সাহায্য করার জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রয়েছেন, তিনি আমাদেরকে গাইড করেন এবং প্রতিটি কষ্টের পুরস্কার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারের শুরুতে আমি আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে কথা বলেছি এবং সন্তান পরিচর্যার দায়িত্বের মাধ্যমে একজন মানুষ সেগুলো বাস্তবে অনুভব করতে পারে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার নিজের ঈমান ও ইয়াকীন অর্জিত হয়। সন্তান পরিচর্যার মাধ্যমে যে ‘গুপ্ত-ভাণ্ডার’ অর্জন করা যায় তা খুব কমসংখ্যক মানুষ আবিষ্কার করতে পারে।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বের মাধ্যমে অনেকভাবে—আপনি আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য লাভ করবেন। যেমন কখনও অনুভব করবেন যে পশ্চিমা দেশ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিতে চলে যাওয়া উচিত অথবা এমন হতে পারে সেখানে আপনার শিশু বা কিশোর সন্তানের জন্য একজন ভালো মুসলিম বন্ধু পেয়ে যাবেন। এবং সে আপনাকে এমন এমন কিছু তথ্য বা জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করবে যাতে আপনার সন্তানের উপকার হবে।

আরেকভাবেও নিজের ঈমান গঠিত হয়, যখন আপনি নিজের কষ্টের ফল চোখের সামনে দেখতে পাবেন। হয়তো একদিন দেখলেন আপনার সন্তান এসে বলছে যে তার স্কুল-টিচার ভুলে পরীক্ষার খাতায় এক নম্বর অতিরিক্ত দিয়েছে! অথবা আপনার সন্তান বলবে যে স্কুলের পরীক্ষাতে অন্য বাচ্চারা দেখাদেখি করছিল কিন্তু সে কারও থেকে কিছু দেখে লেখেনি বা জিজ্ঞাসাও করেনি! আবার এমন হতে পারে, কিশোর বয়সে সন্তান যখন নিজের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা চায়, কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করে, সেই সময়ে হয়তো নিজে থেকেই একদিন আপনার পাশে সালাতে এসে দাঁড়াল!

এভাবেই বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে আপনার প্রচেষ্টার পুরস্কার লাভ করবেন। আল্লাহ এভাবেই তার সৎকর্মশীল বান্দাদের অনেক পুরস্কার দুনিয়াতেই প্রদান করেন। আর আখিরাতের যে পুরস্কার জমা রইল সেটা এত বেশি—যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং জাম্মাতে সুউচ্চ প্রাসাদ বানিয়ে দিন। আমীন।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাঁর কাছে হিদায়াত চাই। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফসের অনিষ্ট হতে এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট হতে। যাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٢﴾

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় (তাকওয়া) করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’
(সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১০২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣٣﴾

‘হে মানবজাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দুজনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া নজর রেখেছেন।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧﴾ يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٨﴾

‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।’ (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

বর্তমান পৃথিবীতে শিশু ও পরিবারের পারস্পরিক অবস্থার চিত্র খুবই করুণ। এটা একজন ব্যক্তিকে বিমর্ষ ও হতভম্ব করে দেয়। পরিবার কাঠামো ভেঙে পড়ছে, বিচ্ছেদ ও তালাকের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, একক পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব, পিতা ছাড়া শিশুর বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়গুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন এগুলো কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং স্বাভাবিক চিত্র! প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে পরিবারের সদস্যরা একত্রে থেকেও সবাই সবার থেকে পৃথক, একত্রে সময়-কাটানো এখন বিরল অভিজ্ঞতা। পুরো মানব-ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। শিশুরা পিতা-মাতার সাথে অন্তরঙ্গ ও অর্থবহ কথোপকথনে পুরো সপ্তাহে তিরিশ মিনিট সময় ব্যয় না করলেও টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল গেইমের পিছনে সপ্তাহে বিশ ঘণ্টা বা আরও বেশি সময় নিমগ্ন থাকছে। মায়েরা অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অধিক হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময়ের জন্য সন্তানকে ছেড়ে যাচ্ছেন কাজের লোক বা অপরিচিত মানুষদের তত্ত্বাবধানে। সমস্যার তালিকা অনেক দীর্ঘ।

এ যুগের পরিবারগুলোর সবচেয়ে লক্ষণীয় ধারা হলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। পাপাচার, নীতিহীনতা ও লাম্পট্য দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা। প্রতারণা, জুয়া, অ্যালকোহল ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার, বিবাহপূর্ব বা বিবাহ-বহির্ভূত-সম্পর্ক ও অন্যান্য অনাচারগুলো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে একটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য ঘটনা হয়ে গেছে। শিশু ও পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কে তিনটি বিপজ্জনক অগ্রহণযোগ্য কাজ হলো **অবাধ্যতা, অসততা এবং অশ্রদ্ধা।**

পিতা-মাতার কথা শোনা ও তাদেরকে শ্রদ্ধা করা আজকের শিশু-কিশোরদের কাছে কোনো জরুরি বিষয় নয়। বন্ধুদের খুশি করার জন্য কিংবা দুনিয়াবি আনন্দের জন্য তারা যে-কোনো অবাধ্যতা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে। এতে তাদের কোনো অনুশোচনা নেই, এমনকি দ্বিতীয়বার ভেবে দেখারও প্রয়োজন মনে করে না। এই অশুভ ব্যাধির বিস্তারকে অবশ্যই গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম পরিবারগুলোও এ-সকল সমস্যা ও ঘটনা থেকে রেহাই পায়নি। পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারগুলো এ-সকল সমস্যায় প্রতিনিয়ত

সংগ্রামরত। আর যেহেতু বিশ্বায়নের করাল গ্রাস সারা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে, ফলে সব দেশের মুসলিমরাই এতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। যদিও-বা ‘গ্লোবলাইজেশন’ পরিভাষার মাধ্যমে নিছক কিছু অর্থনৈতিক বিষয়াদি বোঝানোর কথা ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর উপর বিশ্বায়নের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে কেবল পণ্যসামগ্রী ও সেবা আমদানি হচ্ছে না, বরং আদর্শ, মতবাদ, নৈতিকতার আমদানি ঘটছে; অথচ এগুলো ঐতিহ্যগত বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলো আমদানির প্রধান মাধ্যম হলো মিডিয়া। মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং ম্যাগাজিনসমূহ। আজকের দুনিয়ায় একটি আমেরিকান-শিশু যে-সকল অসার, কাল্পনিক ও নীতিবিবর্জিত দূষিত বিষয়বস্তুর সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে ঠিক সেভাবে পৃথিবীর অপর প্রান্তের আরেকটি শিশু একই অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। একদিকে শিশু-কিশোররা হামলে পড়ে নিজেদেরকে পশ্চিমা মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করতে চাচ্ছে, আরেকদিকে পুরনো প্রজন্মের মানুষেরা নিজেদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পরিচয় টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দিচ্ছে আন্তঃপ্রজন্ম-সংঘাত এবং উল্লিখিত তিনটি ‘অগ্রহণযোগ্য কাজ’ অর্থাৎ **অবাধ্যতা, অসততা এবং অশ্রদ্ধা**।

(পশ্চিমা সমাজের) এই অবক্ষয়গুলো ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবার ও সমাজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে প্রত্যেক প্রজন্মে ইসলামি মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম সংখ্যাপ্রধান দেশেও আজকাল এই দৃশ্য আর বিরল নয় যে উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েরা একত্রে বাধাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা মোটেও ইসলামি পোশাকের (ইসলামিক-ড্রেস-কোড) তোয়াক্বা করে না, বরং তারা মেকআপ-পারফিউমে সুসজ্জিত থাকে। ছেলেমেয়েরা অবাধে ইন্টারনেট চ্যাটিং, ইমেইল এবং ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে। কিশোর-অপরাধ, মাদকের ব্যবহার ও নানাবিধ অপকর্মের গ্রাফ আজ উর্ধ্বমুখী। এর বাইরেও রয়েছে নানান অবৈধ সম্পর্কের ব্যাধি।

সমাধান : এসব দৃশ্যের সাথে আমরা সবাই পরিচিত কিন্তু এই বইয়ের আলোকপাত সমস্যার প্রতি নয়, বরং সমাধানের প্রতি। কেননা এ সকল সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যার সমাধান প্রত্যেক মুসলিমের হাতের নাগালেই রয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগুলো সমাধান করা সম্ভব। সমাধান রয়েছে অবশ্যই ইসলামের মধ্যে। সমাধান রয়েছে এই সম্মানিত দ্বীন ও নীতি-নৈতিকতায়-পরিপূর্ণ-জীবন-বিধানে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে। এটাই একমাত্র কার্যকর ও টেকসই সমাধান। কেননা তিনিই এই সমাধান প্রদান করেছেন—যিনি আমাদের রব—যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের নিজেদের থেকেও ভালোভাবে জানেন। তাঁর বাতলে-দেওয়া সমাধান ব্যতিরেকে যত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, সবই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামের মাধ্যমে সমাধানের বিষয়টি কোনো নতুন ধারণা বা প্রস্তাবনা নয়। মানবজাতির শুরু থেকেই এই সমাধান পেশ করে এসেছেন সকল আঙ্গিয়া আলাইহিমুস সালাম, নেক ব্যক্তিবর্গ এবং উলামায়ে কেরাম। তারা মানুষদেরকে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করেছেন এবং যাবতীয় ধোঁকা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো সেই আহ্বানের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একটি পুনর্জাগরণ ঘটানো এবং চিরায়ত ইসলামি মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় সামাজিক ব্যাধির এটাই প্রকৃত ঔষধ। এটাই শয়তানের বিরুদ্ধে একমাত্র সুদৃঢ় সুরক্ষা। আল্লাহর বিধান হতে বিচ্যুতির মাধ্যমে কেবল ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি পায়, আর আল্লাহর নির্ধারিত জীবন বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বত্র কাঙ্ক্ষিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষদেরকে সেই ঔষধ গ্রহণে রাজি করানোটাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন প্রাণপণ প্রচেষ্টা। উপরন্তু এটি একটি জীবনব্যাপী নিরাময়-প্রক্রিয়া যা আমৃত্যু চলমান থাকবে।

এই বইয়ের প্রধান মনোযোগ আগামী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে শৈশব থেকেই ঈমান ও ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো ও প্রতিপালন করা। যারা জন্ম থেকেই ইসলামের প্রতিষেধক গ্রহণ করে এসেছে তাদের জন্য জীবনব্যাপী এই সমাধানের উপর লেগে থাকা খুব সহজ। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের মধ্যে এটা সহজাতভাবে প্রবাহিত হয়। বাস্তবে শিশুদের মধ্যে একটি বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে যার নাম **ফিতরাত**। ফিতরাত হলো সহজাত, জন্মগত মানবিক বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে ও ঈমান অর্জন করতে পারে। প্রতিটি মানব-শিশুর অন্তরে ঈমানের বীজ সৃষ্টিগতভাবেই বপন করা থাকে। প্রয়োজন শুধু পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটানো, যেন সেই বীজ হতে আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলে-ফুলে শোভিত বৃক্ষ পেতে পারি। এ কারণেই এই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে, ‘Nurturing Eeman in Children’—‘শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা’।

এই কোর্সের ধারাক্রম থেকে আরও প্রত্যাশা করছি, যারা এই প্রতিষেধকের তদারকি করবে তারা নিজেরাও শিখবে এবং নিজেদের মধ্যে ইসলামের বিকাশ ঘটাবে। সাধারণত অন্যকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি শেখে এবং এটি হলো প্যারেন্টিং তথা সন্তান প্রতিপালনের অন্যতম প্রধান অর্জন। যখন আমরা সন্তানের দিকে তাকিয়ে ভাবি, বড় হয়ে তারা কী হবে—তখন সেই প্রশ্নগুলো মূলত আমাদের দিকে উথিত হয়। যখন শিশুদেরকে আমাদের আচরণ নকল করতে দেখি, তখন নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত—আমরা কি চাই শিশুরা আমাদের ওই আচরণগুলো অনুকরণ করুক? আমরা কি তাদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি? দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সন্তান ও পরিবারের জন্য আমরা আসলে কী চাই?

এই বইটি নিছক ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে সন্তান প্রতিপালনের উপর রচিত নয়। কেননা এই বিষয়ে বহু কিতাব রচিত হয়েছে। কীভাবে একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে; সে বিষয়েও এই বইটি রচনা করা হয়নি। কেননা এসব বিষয়ের সাথে আমরা ইতোমধ্যেই পরিচিত। কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয়, যাকাত প্রদান করতে হয় ইত্যাদি আমরা সবাই কমবেশি জানি। বরং এই বইটি হলো মুসলিম পিতা-মাতাদের প্রশিক্ষিত করার একটি প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে তারা নিজের ও সন্তানদের ঈমানকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করতে পারেন। আর সেই কাঙ্ক্ষিত ধাপ হলো ঈমানের উচ্চতর অবস্থা—ইখলাস এবং তাকওয়া অর্জন করা। এই বইটি প্রত্যেক মুসলিমের মন ও মননকে প্রভাবিত করার একটি প্রচেষ্টা, যেন এর মাধ্যমে তাদের ঈমান শক্তিশালী হয় এবং সমাজের অনাচার ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে তাদের অন্তরগুলো সুরক্ষিত থাকে। এই বইটির মাধ্যমে শিশুদেরকে সেই শিক্ষা প্রদান করতে আহ্বান করা হয়েছে যার মাধ্যমে নামসর্বস্ব মুসলিম না হয়ে তারা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। আল্লাহর উপর ঈমানের প্রকৃত অর্থ কী, কীভাবে জীবনের প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক গ্রহণ করতে হয় এবং তাওহীদের অর্থ ইত্যাদি শিক্ষাগুলো অবশ্যই শিশুদেরকে প্রদান করতে হবে। আমরা স্বপ্ন দেখি একদিন তাদের মধ্য থেকেই আদর্শ দাঈ, আন্তরিক ইলম অন্বেষক, নিষ্ঠীক মুজাহিদ, সমাজ-সংস্কারক এবং পবিত্র স্ত্রী ও মমতাময়ী মা তৈরি হবে।

বিশুদ্ধ ঈমান হলো সেই পরশপাথর যার মাধ্যমে মুমিনরা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের দিকে পরিচালিত হয়। তাদের নিজেদের জীবনে, পরিবার এবং সমাজে ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে হারানো মূল্যবোধসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম-প্রদর্শিত প্রশান্তি অর্জিত হয়।

প্রথম পর্ব

শিশুমনে ঈমান পরিচর্যার ভিত্তি

শিশুমনে ঈমান পরিচর্যা ও বিকাশের ভিত্তিসমূহ ইসলামের মূলনীতি-বিষয়ক জ্ঞান, প্যারেন্টিং, মানব প্রকৃতি এবং ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অংশে আলোচিত বিষয়গুলো হলো : আকীদা, ঈমান এবং ইহসান; প্যারেন্টিং-এর দায়িত্ব এবং মৌলিক বিষয়াদি; ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাপ্রদান; ফিতরাত : মানুষের সহজাত প্রকৃতি যা শিশুদের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এগুলোর মাধ্যমে পিতা-মাতা একটি মজবুত ভিত্তি নির্মাণ করতে পারবেন। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা সহজে সম্ভ্রান লালন পালন এবং নানসিক বিকাশ ঘটতে পারবেন।

আকীদা, ঈমান এবং ইহসান

আকীদা এবং ঈমানের মূলনীতিসমূহের মাধ্যমে দ্বীনের ভিত্তি গঠিত হয়। সন্তান প্রতিপালনের জন্যেও এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিভাষাসমূহের অর্থ এবং সন্তান প্রতিপালনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

আকীদা শব্দের অর্থ

আকাঈদ (আকীদা শব্দের বহুবচন) হলো সে-সকল বিষয় যা মানুষের অন্তর দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে ও বিশ্বাস করে—যে বিষয়গুলোকে মানুষ সত্য বলে মেনে নেয়। এটি হলো সুনিশ্চিত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের ক্ষেত্রে, এটি হলো সে-সকল জ্ঞানগত বিষয় যা বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে এসেছে।^[৪] আল্লাহ বলেছেন,

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٨٥﴾

‘রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৫)

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু একমাত্র

[৪] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ২৯-৩১

সত্য আকীদা রয়েছে দ্বীন ইসলামের মধ্যে, কারণ এটাই হলো একমাত্র পরিপূর্ণ, নিখুঁত এবং সুরক্ষিত দ্বীন। আল্লাহ বলেছেন,

النَّوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামাত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।’ (সূরা মাযিদাহ, ৫ : ৩)

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿১১﴾

‘আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।’ (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে যা-কিছুর আদেশ দিয়েছেন তার কিছুই আমি বাদ রাখিনি। আমিও তোমাদেরকে সেগুলোর আদেশ করেছি। আল্লাহ তোমাদেরকে যা-কিছু থেকে নিষেধ করেছেন তার কিছুই আমি বাদ দিইনি। আমিও তোমাদেরকে সেসব থেকে নিষেধ করেছি।’^[৫]

আল্লাহ তাআলা কুরআন এবং ইসলামকে কিয়ামাত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿১২﴾

‘আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।’ (সূরা হিজর, ১৫ : ৯)

কুরআন এবং হাদীসে প্রাপ্ত আকীদা দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের মনকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্তরকে ঈমান, ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে। অন্যান্য ধর্মগুলো শুরু থেকেই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত কিংবা পরবর্তীকালে বিকৃত হয়েছে, যদিও বিচ্ছিন্নভাবে অল্প কিছু সত্য সেখানে থাকুক না কেন।^[৬]

ইসলামি আকীদার গুরুত্ব

মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ইসলামি আকীদা ঠিক ততটাই জরুরি যতটা জরুরি পানি এবং বাতাস। বিশুদ্ধ আকীদা ব্যতিরেকে মানুষ পথহারা ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এটাই একমাত্র আকীদা যা

[৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ১১৮৫, হাসান।

[৬] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ৩৪

শতাব্দীর-পর-শতাব্দী-ধরে-চলে-আসা সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম। ‘আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথেকে এসেছি, এই বিশ্বজগৎ কীভাবে সৃষ্টি হলো, কে এর স্রষ্টা, কেন তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কেন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই মহাবিশ্বে আমাদের ভূমিকা কী, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কী, আমরা খালি চোখে যে দৃশ্যমান দুনিয়া দেখি এর বাইরেও কি অন্য কোনো জগৎ রয়েছে? দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর কি অন্য কোনো জীবন রয়েছে?’—এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন সৃষ্টির শুরু থেকে চলে এসেছে। এগুলোর একমাত্র উত্তর রয়েছে ইসলামে।^[৭]

আকীদা এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক

ঈমানের মূল উপাদান ও ভিত্তি গড়ে ওঠে আকীদার উপর। ঈমানের মূল বুনিয়াদ হলো আকীদা যা অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঈমানের ঘোষণা মৌখিকভাবে প্রদান করতে হয় এবং কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন করতে হয়। শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য ঈমানের জন্য বিশুদ্ধ আকীদা ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি আকীদা সম্পর্কে যত বেশি ইলম অর্জন করবে, তার ঈমান তত বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নততর হবে।^[৮]

ঈমান এবং মুমিন এর অর্থ

ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাস যা একজন ব্যক্তির আকীদা হতে উৎসারিত হয়। এই বিশ্বাস একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, কথা ও কাজকে প্রভাবিত করে। ইসলামের আকীদা খুবই ব্যাপক এবং বিশদ, কিন্তু এর ছয়টি মৌলিক খুঁটি রয়েছে, সেগুলো হলো—আল্লাহর উপর ঈমান, ফেরেশতা, নবি-রাসূলগণ, কিতাবসমূহ, বিচার-দিবস তথা আখিরাত এবং তাকদীরের উপর বিশ্বাস। ‘ঈমান’ এবং ‘মুমিন’ এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের লক্ষ্যে আমরা একটি সুপরিচিত হাদীসের দিকে মনোযোগী হতে পারি। সেই হাদীসে ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। নবিজি বিজ্ঞতার সাথে সকল প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, ‘আমরা একদিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে বসা। এমন সময় আচমকা এক ব্যক্তি এসে হাজির; পরনে পোশাক ধবধবে সাদা, চুল লিকলিকে কালো, শরীরে সফরের কোনো ছাপ নেই, আমাদের কেউ তাকে চিনতেও পারছে না! একপর্যায়ে লোকটি নবি (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বসে; এরপর তার হাটু দুটি নবি (ﷺ)-এর দু-হাটুর সঙ্গে লাগায় এবং তার হাতের

[৭] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ৩৫

[৮] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ৩৯-৪০

তালু দুটি নিজের রানের উপর রাখে। এরপর বলে, মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানান। নবি (ﷺ) বলেন, ইসলাম হলো—তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবাহক, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং আল্লাহর ঘরে পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করবে। লোকটি বলে, আপনি সত্য বলেছেন। তার কথায় আমরা বিস্মিত হই—সে প্রশ্নও করছে, আবার সত্যায়নও করছে!

এরপর সে বলে, তা হলে আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। নবি (ﷺ) বলেন, (ঈমান হলো—) তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, গ্রন্থাবলি ও বার্তাবাহকবৃন্দ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে; এবং তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর। সে বলে, আপনি সত্য বলেছেন। আমাকে ইহসান বা মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন। নবি (ﷺ) বলেন, (ইহসান বা মহত্ত্ব হলো—) তুমি এমনভাবে আল্লাহর গোলামি করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; যদি তুমি তাঁকে দেখার পর্যায়ে না হও, তা হলে তিনি তোমাকে নিশ্চিত দেখছেন!”^[৯]

একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের বইয়ের শিরোনাম ‘**শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা**’ (Nurturing Eeman In Chindren) নির্বাচন করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি, ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এবং মুসলিম ও মুমিনের মধ্যেও সূক্ষ্ম তফাত আছে। সাধারণ অর্থে মুসলিম তো সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের বার্তাকে বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ যিনি কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করেন— আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। অপরদিকে একজন মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রকৃত অর্থে সুদৃঢ়ভাবে ইসলামের উপর ঈমান রাখেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেন। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, যিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত বলে ঘোষণা-প্রদান করেন তিনি একজন মুসলিম। আর আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেওয়ার পরে ব্যক্তির উপর যে-সকল দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় সেগুলো যিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে পূরণ করেন তিনি হলেন মুমিন। একজন মুমিনের ঈমান হয় পরিপূর্ণ এবং অবিচল। তিনি কোনো সন্দেহ-সংশয়ে ভোগেন না, বরং ইসলামের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহর পথে নিজের জান এবং মাল কুরবান করে থাকেন।

একজন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম ঘোষণা দিয়ে ইসলামের স্তম্ভসমূহের অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু হয়তো-বা তার অন্তরে খুব সামান্যই ঈমান রয়েছে কিংবা মোটেও ঈমান নেই। হতে পারে সে একজন মুনাফিক যে মুসলিম হওয়ার ভান করে যাচ্ছে। বর্তমান দুনিয়াতে প্রায় পৌনে দুই শ কোটি মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে। আমাদের মধ্যে কতজন সত্যিকার অর্থে মুসলিম? কয়জন নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে

[৯] মুসলিম : ৮

আত্মসমর্পণ করেছেন? কয়জন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালন করেন? আমাদের মধ্যে কয়জন মুমিন? কয়জন সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী—যারা বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের সকল আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর উত্তর হলো—খুব বেশি মানুষ নয়। এ কারণে সন্তানের আগে পিতা-মাতাকে ঈমানি শিক্ষা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ঈমানের অর্থ কী, কীভাবে সেটা পরিচর্যা করতে হয় ইত্যাদি তাদেরকে আগে শেখাতে হবে। এরপর কীভাবে সন্তানদের মধ্যে ঈমানের বিকাশ ঘটানো যায় সে আলোচনা আসবে।

পারিভাষিক অর্থে দেখা যায়, ঈমান হলো ইসলামের থেকে ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। বস্তুত ইসলামের স্তম্ভসমূহকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ঈমানের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হলো মানুষের অন্তর। সেটাই সকল বিশ্বাসকে ধারণ করে। ঈমানের মধ্যে মুখের কথা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই ঘোষণা প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা হতে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।’^[১০] সালাত, যাকাত, সিয়াম এবং হাজ্জ ইত্যাদি ঈমানের উপাদান, এভাবে অন্যান্য সদগুণসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, যেমন- হায়া (লজ্জা), সততা, ইখলাস ইত্যাদি।

সুতরাং, ইসলাম (আত্মসমর্পণ) ঈমানের একটি অংশ। ইবনু কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ‘ঈমান নিম্নের উপাদানসমূহের মাধ্যমে গঠিত :

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা শিক্ষা দিয়েছেন সেই বিষয়ে ইলম থাকা।
২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত সকল বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা।
৩. তাঁর আনীত সকল বিষয়ে মৌখিক স্বীকৃতির ঘোষণা প্রদান করা।
৪. ভক্তি ও বিনয়-সহকারে তাঁর আনীত সকল বিষয়ে আত্মসমর্পণ করা এবং
৫. গোপনে ও প্রকাশ্যে রাসূল (ﷺ)-এর আনীত বিষয় অনুসারে আমল করা, সেগুলো কায়ম করা এবং বাকি মানুষদেরকে সেদিকে আহ্বান করা।’^[১১]

অনেক উলামায়ে কেরাম ঈমানের তিনটি জরুরি উপাদান উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো :

১. অন্তরে বিশ্বাস,
২. মুখে স্বীকৃতি ও ঘোষণা-প্রদান, এবং
৩. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা।’^[১২]

[১০] বুখারি : ০৯; মুসলিম : ৩৫।

[১১] ইবনু কায়্যিম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ : ১০৭।

[১২] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p.86

অন্তরে বিশ্বাস

মানুষের অন্তর হলো ঈমানের কেন্দ্র এবং ভিত্তি। যদি অন্তর সুস্থ এবং সঠিক থাকে তা হলে বাকি সবকিছু ঠিক থাকবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

‘জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো কলব (অন্তর)।’^[১৩]

এ বিষয়টিকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন ‘স্টেটমেন্ট অব দ্য হার্ট’ বা অন্তরের স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি-প্রদান, সত্যায়ন করা এবং ইলম অর্জন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিষয়কে বলা হয় ‘অন্তরের আমল’—এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, নফল আমল এবং কবুলিয়াতের আশা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর উপর আশা রাখা। ঈমানের এ-সকল জরুরি শর্ত ব্যতীত একজন ব্যক্তি নিজেকে সত্যিকার অর্থে মুমিন দাবি করতে পারেন না। নিছক ঈমানের ঘোষণা প্রদান করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখা পরিপূর্ণ ঈমান অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়।^[১৪]

ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অন্তরে বিশ্বাস করা, কেননা এই ভিত্তিটি অন্যান্য সকল ভিত্তির উপর প্রভাব বিস্তারকারী। প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে, বিকাশ ঘটাতে ও সেটাকে সুরক্ষিত রাখতে এই জরুরি উপাদানসমূহের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যিক। একজন প্রকৃত মুমিন অবশ্যই নিজের অন্তরে অনুভব করবেন যে তিনি সত্যকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন এবং মিথ্যা ও কুফরকে ঘৃণা করেন। তিনি অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসবেন এবং এককভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করবেন—আর একমাত্র তাঁকেই ভয় করবেন।^[১৫]

মুখে স্বীকৃতি প্রদান

ঈমানের দ্বিতীয় উপাদান হলো মুখে ঘোষণা দেওয়া। এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি নিজের ঈমানের প্রতি সত্যবাদী হওয়ার সাক্ষ্যপ্রদান করবেন। সেই সাক্ষ্য হলো— ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল। এই ঘোষণার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে এবং এই ঘোষণা দৈনিক পাঁচবার আযানের সময় ঘোষিত হয়। এই বক্তব্য নিছক কিছু কথার সমষ্টি নয়, বরং এটি বিশুদ্ধ নিয়ত-

[১৩] বুখারি : ৫২; মুসলিম ১৫৯৯।

[১৪] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 87

[১৫] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 89

সহকারে সকল বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজনীয় বিষয় পালনের উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা ও স্বীকৃতির সাক্ষ্য।

একজন ব্যক্তি যদি অন্তরে বিশ্বাস করেন কিন্তু কখনোই মুখে এই কালেমার সাক্ষ্য পাঠ করেন না, অথচ তিনি পাঠ করতে সক্ষম—তা হলে তাকে ঈমানদার বলে বিবেচনা করা হয় না। দুনিয়া কিংবা আখিরাতে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হয় না। মুখে ঈমানের স্বীকৃতি প্রদান করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এ কারণে যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়ার পরেও এই কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করেন না তাকে অমুসলিম বা কাফির সাব্যস্ত করা হয়। তবে যারা নিজেদের প্রাণনাশের শঙ্কায় ভীত হয়ে এবং জোর-জবরদস্তির শিকার হয়ে চূপ থাকতে বাধ্য হন তারা এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নন, তাদের অবস্থা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের ঘোষণা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইখলাস থাকা জরুরি। আরও থাকতে হবে আল্লাহর উপর বিশুদ্ধ বিশ্বাস, সকল প্রকার শিরক বর্জন করা এবং ইসলামের বিধানসমূহের বাস্তবায়ন করা। মূলত ঈমানের ঘোষণায় পরিপূর্ণ এবং সত্যবাদী হওয়ার জন্য অবশ্যই অন্তরে বিশ্বাস থাকতে হবে। যারা মুনাফিক তারা মুখে ঘোষণা প্রদান করে এবং মুসলিম হওয়ার ভান করে কিন্তু তাদের অন্তরে কোনো বিশ্বাস নেই এবং অন্তরের আমলসমূহ সেখান অনুপস্থিত।^[১৬]

আমলে বাস্তবায়ন

এটি একটি সহজাত প্রত্যাশিত বিষয়। অন্তরে ঈমানের মাত্রা অনুসারে একজন ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হবে। যে অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ (আল্লাহর উপরে ভয়, আশা ও ভরসা বিদ্যমান) সে তার নিজের দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আনুগত্য অর্জনে ও নিষেধকৃত বিষয় বর্জনে পরিচালিত করবে। এমনকি সন্দেহজনক কাজ থেকেও বেঁচে থাকবে। অন্তরে সুদৃঢ় ঈমান রয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে না—এটা চিন্তাও করা যায় না। সুতরাং আমল হলো ঈমানের একটি মৌলিক উপাদান। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আরেকটি বিষয় হলো আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর অবাধ্যতার মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায়।^[১৭]

ইহসান এর অর্থ

ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান-সম্পর্কিত হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘হে মুহাম্মাদ! ইহসান কী? তিনি বলেন : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাকে না দেখো তবে নিশ্চয়

তিনি তোমাকে দেখছেন।’

ইহসান হলো ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায় যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। এর অর্থ কোনো কিছুকে সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদিত করা। পরিপূর্ণতা এবং উৎকর্ষতা অর্জন করা। ইসলামি শরীয়ত অনুসারে এর অর্থ উত্তমরূপে ইবাদাত ও আমল সম্পাদন করা যেভাবে আল্লাহ করতে আদেশ করেছেন। ইহসানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে সর্বোত্তম উপায়ে পরিপূর্ণ করা। ইহসানের নির্যাস হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা—এটি একজন মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।

সাধারণ অর্থে অন্য মানুষের সাথে উত্তম আখলাক, সুন্দর ব্যবহার করা, তাদের প্রতি সদয় আচরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। দীন ইসলামের ক্ষেত্রে, অন্যের প্রতি সকল সদাচরণ ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তির মধ্যে ইহসান রয়েছে তিনি অন্যের ক্ষতি না করে উপকার করার চেষ্টা করেন, নিজের সম্পদ, পদমর্যাদা এবং শারীরিক সক্ষমতার মাধ্যমে তিনি মানুষের প্রতি উপকার এবং সহায়তা প্রদান করেন।^[১৮]

আলোচ্য হাদীস অনুসারে ইহসানের মূল অনুপ্রেরণা হলো এই অনুভূতি যে, আল্লাহ সদাসর্বদা একজন বান্দার আমলকে পর্যবেক্ষণ করছেন। যে ব্যক্তি সর্বদা এই অনুভূতির প্রতি সচেতন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকে এবং অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি এবং সম্ভ্রম-শ্রদ্ধা অনুভব করে। মুহসিন ব্যক্তির সকল আমলের নিয়ত হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এর মাধ্যমে অন্তরে বিশুদ্ধতা এবং ইখলাস অর্জিত হয়। যেহেতু নিয়ত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে থাকে, সেহেতু ব্যক্তি সবকিছু সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদনের চেষ্টা করে। ফলাফল হিসেবে সেই ব্যক্তি নিজের আত্মসমর্পণকৃত অবস্থার উৎকর্ষতা অর্জন করে। আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকে এবং অন্যান্য মানুষের সাথেও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।^[১৯]

সন্তান প্রতিপালনের সাথে ঈমান, আকীদা, ইহসানের সম্পর্ক কী?

আলোচ্য বিষয়ের সাথে আমাদের কোর্সের সম্পর্ক হলো, পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করা নয়, বরং তাদের অন্তরে সুদৃঢ় আকীদা ও ঈমানের পরিচর্যা করা। যদি কোনো মুসলিম পরিবার কেবল শিশুদের বাহ্যিক ও ব্যবহারিক দ্বীনি বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করে, কিন্তু আকীদার প্রতি উদাসীন থাকে—তবে সেই প্রচেষ্টার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর দৃষ্টান্ত একটি দুর্বল কাঠামোর উপরে উঁচু ভবন নির্মাণের অনুরূপ। সেই ভবন ধ্বসে পড়বে। কেবল দ্বীনের ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলে শিশুরা শিখবে কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো পালন করার প্রতি তাদের অন্তরে কোনো আন্তরিকতা সৃষ্টি

[১৮] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, pp.94-95

[১৯] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 198

হবে না। তারা হয়তো নিজের পরিবার, পিতা-মাতা বা মুসলিম বন্ধুদের খুশি করার জন্য সেগুলো পালন করবে, কিন্তু সেই আমল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

মুসলিম হওয়ার প্রকৃত অর্থ প্রথমে অনুধাবন করা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে এবং কীভাবে ইহসানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তা অনুধাবন করা জরুরি। শিশুর জন্ম থেকেই তার অন্তরে ঈমানের চাষাবাদ করার কাজ পিতা-মাতাকে শুরু করতে হবে। কীভাবে ইখলাসের সাথে অন্তরে বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হয় তা সন্তানকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে কীভাবে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হয়। কীভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যেন অন্য যে-কোনো ব্যক্তি বা দুনিয়ার যে-কোনো বিষয়ের থেকে অধিক হয়। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

‘... কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৫)

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, ‘কিয়ামাত কখন হবে? রাসূল (ﷺ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই দিনের জন্যে তুমি কি প্রস্তুতি-গ্রহণ করেছ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গেই থাকবে।’^[২০]

শিশুদের অন্তরে সত্য দীন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে এবং কুফর ও নিফাকের (দ্বিমুখী আচরণ, মুনাফেকির) প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—

- (১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়
- (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে মুহব্বত করে এবং
- (৩) আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।’^[২১]

তাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য-লাভ ও পুরস্কারের আশা থাকতে হবে এবং শাস্তি ও অসন্তুষ্টির ভয় রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানকে সত্যিকারের মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন, যারা ভবিষ্যতে আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বার্তা বহন করবে। একবার ভেবে দেখুন, যদি এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে এক

[২০] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p.198-199

[২১] বুখারি : ১৬

শ কোটি মুমিন থাকত তা হলে পৃথিবীর চেহারা কতটা বদলে যেত!

এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিন, এই ফর্মুলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘বিল্ডিং ব্লক’ হলো আকীদা যা ঈমানের ভিত্তি। ঈমান গড়ে ওঠে আল্লাহর বিষয়ে জ্ঞান এবং একত্ববাদের উপর, তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপর, তাঁর শক্তি এবং মহিমা, ক্ষমা এবং রহমতের উপর, তাঁর ইচ্ছা এবং তাকদীরের বিধান ও নবি রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসের উপর। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে সঠিক এবং সুদৃঢ় আকীদার গুরুত্বের শেষ নেই, কেননা বিশ্বাস থেকেই কাজের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামদের ইসলামের ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর আগে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আকীদা শিখিয়েছেন। ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া নিশ্চিত করার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে। যদি পিতা-মাতা সন্তানদের কেবলমাত্র বিশুদ্ধ আকীদার শিক্ষা প্রদান করে এবং বাহ্যিক আমলের কিছুই না শেখায়, তবুও সেই সন্তান জান্নাতে যাওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে তাদের চেয়ে—যারা অনেক সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, দান খয়রাত করে, কিন্তু কবর-মাজার পূজা তথা শিরক করে।

একজন ব্যক্তির মধ্যে সত্য-মিথ্যা পৃথক করার যোগ্যতা (বিবেক) বিকাশের জন্য এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সঠিক বিশ্বাস থাকা জরুরি। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং সত্য-মিথ্যা পৃথক করার ক্ষমতা কেমন সেই ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে বৈধ ও সঠিক কাজটা করতে পারে। সে স্বেচ্ছায় উত্তম বিষয় নির্বাচন করে, জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করতে হয় না।

এ কারণে যে-শিশুর মধ্যে ঈমান এবং তাকওয়া বিকশিত হয়েছে তাকে প্রতিপালন করা অনেক সহজ। যে শিশু স্বেচ্ছায় আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কাজের পুরস্কারের দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়, ভালো আচরণের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ আচরণের জন্য শাস্তি প্রদানকে উৎসাহিত করা হয়। এই টেকনিকগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু এগুলোকে সন্তান প্রতিপালনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি পিতা-মাতা সন্তানের অভ্যন্তরীণ (ঈমানি) শক্তি বিকাশে সহায়তা প্রদান করে, তবে এই ধরনের টেকনিকের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় মোটেও প্রয়োজন হয় না। ঈমান বিকাশের দিকে প্রধান মনোযোগ দিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে সন্তুষ্টি এবং পুরস্কার অর্জনের দিকে, মানুষের মূল্যায়নের দিকে নয়। শিশুর অন্তরে গভীরভাবে এ বাস্তবতা অনুধাবন করাতে হবে যে মানুষের প্রশংসা, পুরস্কার বা যে-কোনো দুনিয়াবি বস্তুগত কিংবা সামাজিক পুরস্কারের থেকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন অনেক অনেক উত্তম।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ নিবেদন—পিতা-মাতা সন্তানের অন্তরে ঈমানের পরিচর্যা ও

বিকাশ ঘটাবেন যেন তারা সফলতা অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র দুনিয়াতে নয়, বরং আখিরাতের সফলতা হলো প্রধান সফলতা। এ বিষয়টি শিশুদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা সম্পদ বা ক্ষমতার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় না, বরং সফলতা পরিমাপ করা হয় আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং আখিরাতের জীবনে জান্নাত অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন,

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١١٨﴾

‘কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণা। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১১৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

‘আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহা সফলতা।’ (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৯)

নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বশীলতা অনুধাবন

মুসলিম হিসেবে সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব অনুধাবন করা খুব জরুরি। শিশুদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো ইত্যাদি বাধ্যবাধকতা বোঝা খুবই জরুরি। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ①

‘মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ-হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ।’ (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬)

এই আয়াতের অর্থ এবং প্রয়োগ কী? এখানে সাধারণভাবে প্রত্যেক মুমিনকে সাবধান করা হয়েছে যেন সে নিজেকে রক্ষা করে, নিজের পরিবার এবং সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে—যে আগুন ইতোমধ্যেই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আছে এবং যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। এটি একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা যা অবশ্যই সিরিয়াসলি গ্রহণ করা উচিত। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই প্রধান ফোকাস হওয়া উচিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

‘হে কাফিৰ-সম্প্ৰদায়! তোমরা আজ ওয়ৰ পেশ কৰো না। তোমাদেৱকে তাৱই প্ৰতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা কৰতে। মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাৰ কাছে তাওবাহ কৰো—আন্তৰিক তাওবাহ। আশা কৰা যায়, তোমাদেৱ পালনকৰ্তা তোমাদেৱ মন্দ কৰ্মসমূহ মোচন কৰে দেবেন এবং তোমাদেৱকে প্ৰবেশ কৰাবেন জান্নাতে, যাৰ তলদেশে নদী প্ৰবাহিত। আল্লাহ সেদিন নবি এবং তাঁৰ বিশ্বাসী সহচৰদেৱকে অপদস্থ কৰবেন না...’ (সূৰা তাহীম, ৬৬ : ৭-৮)

বিচাৰ-দিবসে কাফিৰদেৱ কুফৰেৰ পক্ষে কোনো অজুহাত চলবে না। এই আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেৱকে ইখলাসেৰ সাথে তাওবাহ কৰতে বলেছেন যেন তিনি তাদেৱকে সেই জান্নাতে প্ৰবেশ কৰাতে পাৰেন যা ইতোমধ্যেই সুসজ্জিত অবস্থায় আছে। একজন ব্যক্তিৰ চিৰস্থায়ী ঠিকানা নিৰ্ধাৰিত হবে দুনিয়াতে তাৰ বিশ্বাস ও কাজকৰ্মেৰ ভিত্তিতে। পিতা-মাতা ও সন্তানদেৱ কাজেৰ চিৰস্থায়ী ফলাফল এই বিষয়েৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীল। প্ৰিয় পাঠক! জান্নাত ও জাহান্নামেৰ মধ্যে কোনটি উত্তম? কোন ঠিকানাৰ জন্য আমরা নিজেদেৱ প্ৰস্তুত কৰছি?

দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা

ৰাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘তোমরা প্ৰত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদেৱ প্ৰত্যেকেই তাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসা কৰা হবে। ইমাম (নেতা) একজন দায়িত্বশীল, তাকে তাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসাবাদ কৰা হবে। পুৰুষ (স্বামী) তাৰ পৰিবাৰবৰ্গেৰ দায়িত্বশীল, তাকে এ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসা কৰা হবে। স্ত্ৰী তাৰ স্বামীৰ সংসাৰেৰ দায়িত্বশীল, তাকে এ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসা কৰা হবে। খাদেম তাৰ মুনিবেৰ ধন-সম্পদেৰ দায়িত্বশীল, তাকে তাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসা কৰা হবে। সুতৰাং তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদেৱ প্ৰত্যেকেই তাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসা কৰা হবে।’^[১২]

এই হাদীসে ৰাসূলুল্লাহ (ﷺ) গুৰুত্বাৰোপ কৰে জানিয়েছেন সন্তান প্ৰতিপালন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ একটি দায়িত্ব যা আন্তৰিকভাবে ও সিরিয়াসলি পালন কৰতে হয়। পৰকালেৰ জীৱনেৰ জন্য শিশুদেৱ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰতি মনোযোগী হয়ে দুনিয়াতে পিতা-মাতা নিজেৰ সন্তানেৰ পৰিচৰ্চা কৰেন, যত্ন নেন এবং তাদেৱ সুৰক্ষিত ৰাখেন। দায়িত্বশীলতাৰ সাথে আসে জবাবদিহিতা, যেমনটি পূৰ্বে উল্লেখিত কুৰআনেৰ আয়াতগুলোতে এসেছে। আল্লাহ প্ৰত্যেক পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ কৰবেন এবং তাদেৱ দায়িত্বেৰ হিসাব গ্ৰহণ কৰবেন—বিচাৰ-দিবসে তাদেৱ সেই আমলনামা প্ৰদান কৰা হবে। ফলে সন্তান প্ৰতিপালন কৰাৰ দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় কৰাৰ মাধ্যমে একজন ব্যক্তিৰ জন্য জান্নাতেৰ দৰজা

উন্মুক্ত হতে পারে অথবা ব্যর্থ হলে জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন নিছক একটি দায়িত্ব নয়, বরং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। পিতা-মাতার হাতে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে ওঠে যারা ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে হয়তো সফলতা অর্জন করবে অথবা ব্যর্থতার মুখ দেখবে। সুতরাং মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ ও সফলতা নির্ভর করে পিতা-মাতার সফলতার উপর। একজন শিশু অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে নিজের পিতা-মাতার মাধ্যমে বেশি প্রভাবিত হয়। সন্তানকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে পুরো সমাজকে প্রভাবিত করা যায়। পরিবার হলো সমাজ গঠনের ‘বিস্তিং ব্লক’ বা ভিত্তি। আর ভিত্তি শক্তিশালী হলে পুরো সমাজ শক্তিশালী হবে। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে পিতা-মাতাকে নিজের দায়িত্ব বুঝতে হবে। নিজেদের ভূমিকার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই ভূমিকার সাথে জড়িত সকল দায়িত্বকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা এবং এই ব্যাপারে তারা বিচার-দিবসে জিজ্ঞাসিত হবেন, এই মৌলিক বিষয়টি সকল পিতা-মাতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এর গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আল্লাহ বলেছেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾

‘এবং জেনে রেখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। বস্তুত আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।’ (সূরা আনফাল, ৮ : ২৮)

অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

‘তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।’ (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫)

এই আয়াতগুলোতে যে-আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো ‘ফিতনা’ যার অনুবাদ ‘পরীক্ষা’, ‘গুণগত মান যাচাই করা’। দুনিয়া নানাবিধ পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। এটা আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ যে, তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা, বিপদআপদ ও অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে যাচাই করবেন। সন্তান ও পরিবার সেই মান যাচাইয়ের একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফিরদের থেকে পৃথক করেন এবং সত্যবাদী আস্তরিক ব্যক্তিদেরকে মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের থেকে পৃথক করেন। আল্লাহ বলেছেন,

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢١﴾

‘লোকেরা কি মনে করে রেখেছে—আমরা ঈমান এনেছি—কেবলমাত্র এ কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাকা’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২-৩)

আল্লাহ মানুষকে বিপদআপদ এবং নিয়ামাত উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন এবং জেনে নেন কারা ধৈর্যশীল, শোকর আদায়কারী, কারা অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য। তিনি যাচাই করে নেন কারা তাঁর বাধ্যগত বান্দা হতে চায় এবং কারা অবাধ্যগত ও উদ্ধত। এরপর বিচার-দিবসে ফলাফল অনুসারে তিনি কাউকে শাস্তি এবং কাউকে পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ নানাভাবে বিপদ আপদের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, ফল-ফসলের ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি, জীবন এবং বাসগৃহের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তিনি কাউকে সন্তান দিয়ে কিংবা কাউকে সন্তান না দিয়েও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٣﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

‘এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। এবং যখনই কোন বিপদ আসে তারা বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। তারা সে-সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াত-প্রাপ্ত।’ (সূরা বাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৭)

পরীক্ষা এবং বিপদআপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রহমত, যেন এগুলোর কারণে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাওবাহ করে এবং আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়কে পরিত্যাগ করে—যেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন যেন আমাদের অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ হতে পারে এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে আমরা ফিরে আসতে পারি। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٥﴾

‘সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোনো-না-কোনো) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আশ্বাদন করাতে থাকব, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে।’ (সূরা সাজদা, ৩২ : ২১)

আবার কখনও আল্লাহ তাঁর বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্যেও পরীক্ষা করেন এবং তাদের গুনাহ মোচন করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা, বোগ-ব্যাদি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।’^[২৩]

তিনি আরও বলেছেন,

‘মুমিন নারী ও পুরুষ জান-মাল ও সন্তানের বিষয়ে বিপদের সম্মুখীন হতেই থাকে, যতক্ষণ-না সে এমনভাবে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করে যে, তার কোনো পাপ অবশিষ্ট নেই।’^[২৪] (অর্থাৎ মুমিনের জন্য বিপদ ও ফিতনাও নিয়ামাত, যার ওসিলায় আল্লাহ গোনাহ মাফ করেন)।

অধিকাংশ মানুষ ভুলে যায় যে বিভিন্ন নিয়ামাত দিয়েও আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ধনসম্পত্তি, সন্তানসন্ততি আমাদের জন্য পরীক্ষা এবং আমানত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যাচাই করবেন এবং জেনে নিবেন কারা তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায় করে কিংবা কারা পরিবার ও সন্তানের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। দুনিয়াতে অনেক মানুষ ধনসম্পত্তি, বৈষয়িক বিষয়াদি এবং সন্তান সন্ততির প্রতি নিমগ্ন হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এগুলো আল্লাহর ইবাদাত ও স্মরণ থেকে মানুষকে উদাসীন ও অমনোযোগী করে দেয়।

পরীক্ষা শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ পৃথক করাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কীভাবে পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে বড় করেন, সেখানেও রয়েছে পরীক্ষা। তারা কি তাদের সাথে দয়া, ভালোবাসা এবং সম্মানজনক আচরণ করেন? তারা কি তাদেরকে ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞান ও নিয়ামাত-সহকারে বড় করেন? তারা কি তাদেরকে আখিরাত এবং জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করে দেন? নাকি তারা সন্তানদেরকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেকুলার মতাদর্শ ও বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠান অনুসারে বড় করেন? তবে কি তারা সন্তানদের সাথে নিজেরাও জাহান্নামে যেতে চান? সুতরাং, এগুলো হলো পরীক্ষার প্রকৃত বাস্তবতা। এভাবে অন্যান্য সকল পরীক্ষাতেও আল্লাহ আমাদের যাচাই করেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ এই পরীক্ষাতে ব্যর্থ। তারা যত সম্ভব এই পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চান। সপ্তাহে প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা বা এর থেকেও বেশি সময়

[২৩] বুখারি : ৫৬৪০; মুসলিম : ২৫৭২।

[২৪] তিরমিযি : ২৩৯৯, সহীহ।

সন্তানকে ডে-কেয়ার কিংবা কাজের মানুষের কাছে রেখে দেন, যাদের কাছে শিশু নিজের শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে বাধ্য হয়। শিশুর যত্ন নেওয়ার চেয়ে অন্যান্য বিষয়ে পিতা-মাতারা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, যেমন : ক্যারিয়ার, অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা, নিজের শখ-আহ্লাদ পূরণ করা অথবা বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোতে তারা ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন প্রজেক্টে নিজেদের সময় ও শ্রম ব্যয় করেন, কিন্তু সন্তানদের জন্য তাদের কোনো সময় নেই, মনোযোগ নেই। বর্তমান দুনিয়ায় শিশুরা পিতা-মাতার যথেষ্ট সময় এবং মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলাফল?—পুরো সমাজ নানারকম সমস্যায় আক্রান্ত।

পিতা-মাতারা খেয়াল করেন না সন্তানের প্রতি অবহেলার মাধ্যমে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তারা একটি সোনালি সুযোগ হাতছাড়া করছেন। সন্তানের পরিচর্যার মাধ্যমে চিরস্থায়ী ও আধ্যাত্মিক পুরস্কার অর্জন করা যায়। এই সুযোগ তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, কিন্তু তারা এর ফায়দা উঠাতে ব্যর্থ। সন্তান প্রতিপালনের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না কষ্ট যত বড়, পুরস্কারও তত বেশি। পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার অর্জন করা সম্ভব। সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে ধৈর্য, নিঃস্বার্থতা এবং আত্মত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয়। আল্লাহ বলেছেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

‘তোমাদের কি ধারণা—তোমরা এমনিই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।’
(সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৪২)

এই পরীক্ষায় ঠিকঠাক পাশ করে গেলে পিতা-মাতার মধ্যে নানা রকমের সদৃশ গুণ বিকশিত এবং সুদৃঢ় হয়। সন্তানের মধ্যে ঈমানি যোগ্যতা বিকাশের লক্ষ্যে পিতা-মাতা শুধু সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না, বরং তাদের নিজেদের মধ্যেও সেই যোগ্যতার বিকাশ ঘটান। এ বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক। সন্তানকে ঈমানদার হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে অজান্তেই নিজের ঈমানের পরিচর্যা নেওয়া হয়ে যায়। এভাবে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও রহমতের রহস্য বুঝতে পারে। দুনিয়ায় থেকেই জান্নাতের স্বাদ পাবার কি আর কোনো সুযোগ আছে?

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার ও আনন্দ

যে-কোনো দায়িত্বের মতো পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের মধ্যেও রয়েছে পুরস্কার ও আনন্দ। সন্তান প্রতিপালনে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব এবং প্রচেষ্টা। তবে কষ্টের থেকে পুরস্কার অনেক বেশি। বস্তুত এর মাধ্যমে দুনিয়াতেই আল্লাহর তরফ থেকে

অসাধারণ সব পুরস্কার পাওয়া যায়, যেমন : সন্তানের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, বন্ধন ও মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতা, বিভিন্ন খুশির মুহূর্ত শেয়ার করা, হাসিমুখের একটি চাহনি, উষ্ণ আলিঙ্গন এবং যত্নের ছোঁয়া। একবার শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, শিশুর কোমল ত্বকের স্পর্শ অনুভব করুন, তার মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ শুনুন! তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন এই উপহারের সৌন্দর্য কত বেশি! এ যেন জন্মাতের এক টুকরো আল্লাহ দুনিয়াতেই আমাদের দিয়ে দিয়েছেন!

সর্বোপরি, নিবেদিতপ্রাণ পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বড় হতে দেখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কেননা, যে সন্তান আল্লাহকে ভালবাসবে, আনুগত্য করবে, সমাজে উত্তম অবদান রাখবে এবং পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দুআ করবে—সেই সন্তানের মাধ্যমে পিতা-মাতার আমলনামা নেকী যোগ হতে থাকবে। নেক সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি ব্যতিক্রম বিষয় ছাড়া তার আমলনামায় কিছুই যুক্ত হয় না—সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানের দুআ।’^[২০]

সুতরাং, নেক সন্তান রেখে যাওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও নেক আমল লাভ করতে থাকে—যা বিচার-দিবসে তার জন্য উপহার হিসেবে উপস্থিত হবে। অতএব, সন্তানের পেছনে পিতা-মাতার সকল প্রচেষ্টাই বিরাট পুরস্কার বয়ে আনে!

সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

কীভাবে মা-বাবা এবং সন্তান নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে? কীভাবে আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব আদায় হতে পারে? কীভাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারে? নিজের সন্তানের জন্য কী লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত? এই পয়েন্টগুলো সমস্ত বই জুড়েই আলোচিত হবে। প্রথমে আমাদের নিজেদের জন্য ও সন্তানদের জন্য কিছু লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুরু করা যাক।

লুকমান হাকীম এর ঘটনা

সূরা লুকমানে আমরা লুকমান আলাইহিস সালাম-এর বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশের আলোচনা দেখতে পাই। এগুলো তিনি নিজের সন্তানকে প্রদান করেছিলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ ۝ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تِلْكَ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُمْضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

‘আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসিত। স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বলল, হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম। আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু-বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যার ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ, যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো। (আর লুকমান বলেছিল), হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তা হলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে বৎস! সালাত কয়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবার করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গিতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মগুস্তরী ও অহংকারীকে। নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।’ (সূরা লুকমান, ৩১ : ১২-১৯)

লুকমান হাকীম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাকে আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে হিকমাহ দান করেছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানকে সেই হিকমাহ হতে নানা মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন যেন সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাওহীদের শিক্ষা এবং শিরক হতে সতর্কতার প্রতি— কারণ এটিই ইসলামি আকীদার মূল ভিত্তি। প্রথমে আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের পর তিনি পিতা-মাতার আনুগত্য এবং সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তান প্রতিপালনের জন্য এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যদি শিশুরা নিজেদের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অঙ্গীভূত করে নেয়, তবে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব অনেক সহজ হয়ে আসে।

আল্লাহ এবং পিতা-মাতার অধিকারসমূহ সন্তানকে জানানোর পর তিনি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বলেছেন। এরপর লুকমান হাকীম আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ সন্তানের কাছে প্রকাশ করেছেন; সেটি হলো আল্লাহ সব বিষয়ে খবর রাখেন, হোক সেটা গোপন কিংবা প্রকাশ্য কোনো বিষয়। তিনি বলেছেন,

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

‘হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তা হলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন।’ (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৬)

আমরা যা করি আল্লাহ সবকিছু জানেন। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। গুনাহের কাজকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। এরপর লুকমান হাকীম সুন্দরভাবে সালাত আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সন্তানকে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করতে আদেশ করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিপদআপদ আসবে, সেক্ষেত্রে তাকে সবর করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং অহংকার ও বড়াই করতে নিষেধ করেছেন।

এই কয়েকটি আয়াতে পিতা-মাতার জন্য হিকমতের গুণ্ডাগুলোর সংরক্ষিত রয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে শিশুদের জন্য অনেক মূল্যবান লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় :

১. বিশুদ্ধ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর উপরে ঈমান অর্জন এবং শিরক বর্জন।
২. পিতা-মাতার প্রতি দয়া, শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য প্রদর্শন।
৩. তাকওয়া (আল্লাহ-সচেতনতা) অর্জন এবং তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের ব্যাপারে সচেতন থাকা।

৪. সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করা।
৫. সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা।
৬. জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলো ধৈর্য-সহকারে অতিক্রম করা।
৭. বিনয় এবং মিষ্টতা অবলম্বন করা।
৮. মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং চরমপন্থা পরিহার করা।

এগুলোর সাথে আরও কয়েকটি বিষয় সংযুক্ত করা যায় :

১. ঈমান-আকীদায় দৃঢ়তা অর্জন।
২. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে সম্পর্ক গড়া।
৩. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও কিতাবের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা।
৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা।
৫. সকল বিষয়কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে অনুধাবন করা।
৬. ইসলামি ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের বিকাশ।
৭. ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে লেনদেন করা।
৮. সকল মানুষের প্রতি দয়া, মমতাময় এবং সুন্দর ব্যবহার করা।
৯. বিশ্বের সকল মুসলিমদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া (সহায়তা প্রদান, তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা)।
১০. মানুষকে আল্লাহ এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করা।
১১. মুসলিম পরিচয়ে সম্মান অনুভব করা।

আরো কিছু কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে:

১. আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া।
২. অনুপ্রাণিত হওয়া।
৩. দায়িত্বশীলতা।
৪. অধ্যবসায়ী, কঠোর পরিশ্রমী হওয়া।
৫. সক্ষমতা এবং দক্ষতা অর্জন।
৬. সমৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত থাকা।
৭. সততা।
৮. বিশ্বস্ততা।
৯. সাহসিকতা।

১০. নেতৃত্ব।

এসব লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা সন্তানের ঈমান, আকিদা এবং তাকওয়ার বিকাশ ঘটাতে পারি। বস্তুত এভাবে ব্যক্তির ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-পরিয়চয় গঠিত হয়। এটা তার মন ও মননের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তার সকল প্রচেষ্টা ব্যয় হবে ঈমান ও ইহসানে পরিপূর্ণ একটি ইসলামি জীবন অতিবাহিত করার লক্ষ্যে। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সত্যিকার সফলতা অর্জিত হয়। পরিশেষে, পিতা-মাতা এবং সন্তান— উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য জাম্মাত অর্জিত হয়!

সন্তান প্রতিপালনের বুনিয়াদি বিষয়সমূহ

শিশুদের ঈমান বিকাশের মূখ্য বিষয়গুলো আলোচনার পূর্বে সন্তান প্রতিপালনের মৌলিক কিছু বিষয়ে আলোচনা করা জরুরি। এর মাধ্যমে একটি ভিত্তি স্থাপিত হবে। এই অধ্যায়ে বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব এবং সন্তান প্রতিপালনে এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরো আলোচিত হয়েছে নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের ভূমিকা, সন্তানের ঈমান বিকাশের পূর্বে পিতা-মাতার নিজেদের ঈমানের পরিচর্যা গুরুত্ব, সন্তানের মৌলিক অধিকার (পিতা মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য), পিতা-মাতার অধিকার (সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য), শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর গুরুত্ব, শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক, মা ও শিশুর প্রথম অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়সমূহ। শেষ অংশে নেক সন্তান কামনা করে আল্লাহর কাছে দুআ করার কিছু মূল্যবান উপদেশ সংযুক্ত রয়েছে।

বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿١١﴾

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করো।’ (সূরা রুম, ৩০ : ২১)

সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। যে-কোনো কাঠামো নির্মাণের জন্য প্রথমে একটি ‘বিল্ডিং ব্লক’ প্রয়োজন হয়, পরিবার হলো সমাজের সেই ‘বিল্ডিং ব্লক’ বা ভিত্তি। এ কারণে শারীআতের বহু বিধানের মাধ্যমে পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা

হয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কে কেন্দ্র করেই পরিবারের অন্যান্য সকল বিষয় আবর্তিত হয়। যদি এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি সূচক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে, তা হলে আশা করা যায় বাকি 'সিস্টেম' ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। আর যদি বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো ধরনের অনৈক্য, ফাটল বা মতভেদ দেখা দেয়, তা হলে সম্পূর্ণ সিস্টেমে গোলযোগ সৃষ্টি হবে। একটি শক্তিশালী বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একটি কার্যকর পরিবার গড়ে ওঠে। এভাবে সমাজের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ইসলামে বিয়ের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সক্ষমতা রাখে, সে যেন বিয়ে করে ...'^[২৬] তিনি আরও বলেছেন, 'যে বিয়ে করল, নিশ্চয়ই সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। সুতরাং সে যেন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।'^[২৭] অর্থাৎ বিয়ে ইবাদাতের একটি অংশ এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে অগ্রগামী করার এক বিরাট সুযোগ। আল্লাহ পৃথিবীর সকল নারী পুরুষকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং বৈবাহিক বন্ধনে পবিত্রতা দান করেছেন। ফলে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাহচর্যে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, একে অপরের কাজে সহযোগিতা করে এবং আল্লাহর ইবাদাতে পরস্পর সহযোগী হয়ে যায়। যখন আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবনে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশান্তির (সাকিনা) বাস্তব ফল দেখতে পাই।

বিয়েকে ইবাদাতে রূপান্তরিত করার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া জরুরি। বিয়ের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং শারীআতের বিধান অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা। বিবাহিত দম্পতিকে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন ও আনুগত্যে অগ্রগামী হওয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। নিজেদের ঈমান বিকশিত করার জন্য এবং তাকওয়া জাগ্রত রাখার জন্য ইলম অর্জনের বিকল্প নেই। জীবনে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তি হতে হবে কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূলের সুন্নাত। এভাবে তারা তাদের সন্তানদের একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত পরিবেশে বড় করতে পারবেন।

বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে খুবই সতর্কতার সাথে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত। পাত্র বা পাত্রীর সামাজিক মর্যাদা, সম্পদ, জাতীয়তা, সৌন্দর্য কিংবা অন্যান্য বিষয়ের থেকে ঈমানি অবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীদের বিবাহ করা হয়। সম্পদ, বংশ মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারিতা।

[২৬] বুখারি : ৫০৬৫।

[২৭] তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত : ৭৬৪৭; দুর্বল।

অতএব তুমি দীনদার নারীর সন্ধান কৰো। অন্যথায় তোমার দু-হাত ধূলি পুসরিত হোক।^[১০]

একটি শক্তিশালী ইসলামি পরিবার গঠনের জন্য দীনদারিতা বাদে অন্য কোনো উপাদান উপকারী নয়। ইমান এবং ইলম অমূল্য সম্পদ। বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে এবং সকল কাজ ও সিদ্ধান্তে আল্লাহর দেখানো হিদায়াত অনুসরণ করেই বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করা উচিত। আর বৈবাহিক সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি জীবনভর নম্র ও দয়ালু থাকা এবং নিজের দায়িত্বসমূহ পালন করা একটি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা।

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾

‘নারীদের সাথে সন্তোষে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১১)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘সর্বোত্তম মুসলিম সে যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর; আর তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে নিজের স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণকারী।^[১১] বিয়ে এমন এক সম্পর্ক যেখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, মমতা ও প্রেম থাকতে হয়। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সুরক্ষা, যত্ন এবং উদারতা প্রদর্শন করেন, আর স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল থাকেন।

বৈবাহিক সম্পর্কে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সাহায্য, সহযোগিতা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। নারী পুরুষের সৃষ্টিগত ভিন্নতার মধ্যে একে অন্যের সুখ খুঁজে নেয়। বস্তুত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত অপরের যত্ন নেওয়া এবং প্রয়োজন পূরণ করা। নিজের ইচ্ছা বা চাহিদার চেয়ে সঙ্গীর সুখকে সব সময় প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে প্রশান্তি ও সামঞ্জস্য খুঁজে পায়।

বিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত, সেই সাথে একটি পরীক্ষাও বটে। বৈবাহিক সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি সমব্যথী হওয়া, নিবেদিতপ্রাণ থাকা, অপরকে বোঝার চেষ্টা করা, ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ত্যাগ-স্বীকার করতে হয়, ছাড় দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর উচিত পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া এবং অপরের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতায় ছাড় দেওয়া। যদি একজন ইসলামের সাংঘর্ষিক কিছু করে তা হলে অপরজনের কর্তব্য হলো তাকে নসিহত করা এবং সত্যের পথে আবার ফিরিয়ে আনা। কোনো বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলে আলোচনার মাধ্যমে, উত্তম আখলাকের সাথে সন্তোষে সমাধান খুঁজে নেওয়া। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, সাধ্যমত সর্বোচ্চ নেকী

[১০] বুখারি : ৫০৯০; মুসলিম : ১৪৬৬।

[১১] তিরমিযি : ১১৬২, হাসান সহীহ।

অর্জনের চেষ্টা করা এবং আল্লাহর হিদায়াত ও ছকুমের উপর নির্ভর করা।

বিয়ে এবং সন্তান প্রতিপালন

সন্তানের কথা ভেবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্কে মজবুত রাখা। বিয়ে যদি পরিবারের কেন্দ্র হয় তবে সেই সম্পর্কে মজবুত ও সমৃদ্ধ রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে দাম্পতির পারস্পরিক বৈবাহিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো বুঝতে হবে, সাধ্যমতো সেগুলো পূরণের চেষ্টা করতে হবে। সন্তান প্রতিপালনের বিষয়ে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে তথ্য জানতে হবে (উদাহরণ : সন্তানকে শাসন করার পদ্ধতি, সন্তানের মনোদৈহিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি)। বিশেষত, সন্তানকে শাসন করতে হলে সেটা কীভাবে করা উচিত, কী পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা উচিত, এসব নিয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। এভাবে প্যারেন্টিংকে অধিক কার্যকর, সহজবোধ্য এবং সংঘাতমুক্ত করা যায়।

এটা বোঝা খুব জরুরি যে পিতা-মাতার দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমেই সন্তানের সামনে বৈবাহিক জীবনের একটি বাস্তব মডেল উপস্থাপিত হচ্ছে। পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালনের যে <মডেল> অনুসরণ করছে—সেটা দেখেই সে শিখছে। শিশুর ঈমান, আখলাক এবং অন্যান্য আচার-আচরণে এই মডেলিং বা দেখে শেখার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বস্তুত, শিশুরা মৌখিক আদেশ অপেক্ষা বাস্তব নমুনা দেখে শিখতে বেশি অভ্যস্ত। এ কারণে পিতা-মাতাকে নিজেদের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। গবেষণায় দেখা যায়, যেসব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিয়ত নানা রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলে, তাদের সন্তানদের উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সন্তানের সামনে অবশ্যই পারিবারিক বিবাদ (marital conflict), ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদি এড়িয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন সমস্যা হতেই পারে, সেক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা, অপরকে ছাড় দেওয়া, সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। একটি সুখী সমৃদ্ধ পরিবারের জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, উদারতা, যৌক্তিক এবং শান্তিপূর্ণ আচরণ থাকা জরুরি।

নারী-পুরুষের সুনির্দিষ্ট ও পৃথক ভূমিকাসমূহ পালন করা

(মানুষ হিসেবে) নারী ও পুরুষকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একই মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়। উভয়কেই দুনিয়াতে বিভিন্ন আমানতের উপর দায়িত্বশীল করা হয়েছে। উভয়ের উপরেই অনুরূপ দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। উভয়কেই বিচার-দিবসে ঈমান-আমলের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জেভারের ভিত্তিতে ইসলামে নারী-পুরুষ একে অপরের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে তাকওয়া এবং নেক আমলের ভিত্তিতে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

‘হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে অধিক তাকওয়াবান, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।’ (সূরা হুজরাত, ৪৯ : ১৩)

এখানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পৃথক লিঙ্গ, নৃতত্ত্ব, জাতি-গোষ্ঠী বা ভাষার ভিত্তিতে কাউকে অপরের থেকে উত্তম বা অধম নির্ধারণ করা হয় না। এই সাধারণ কাঠামোর ভিত্তিতে আল্লাহ নারী-পুরুষের পৃথক দৈনন্দিন কার্যক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সম্মানিত। প্রত্যেককেই আল্লাহ সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তাদের দায়িত্ব পূরণের জন্য। আল্লাহ বলেছেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

‘পুরুষ নারীর কর্তা। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

পুরুষ পরিবারের কর্তা। বাড়ির সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্বও পুরুষের কাঁধে। নারীদের দায়িত্ব সন্তানদের বড় করা, তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ, উন্নত আখলাক শিক্ষা দেওয়া, বাড়ির দেখাশোনা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ প্রদান করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নারীকে অবশ্যই স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হবে। একটি সুখী-সমৃদ্ধ পরিবারের জন্য নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করা খুবই জরুরি। কেননা, আল্লাহ সবকিছুকে ইনসাফ ও ভারসাম্যের উপর সৃষ্টি করেছেন। পরিবার তেমনই একটি সিস্টেম। এটি কেবল তখনই সবচেয়ে উত্তমভাবে কার্যকর থাকে যখন সেটা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়। যখন প্রাকৃতিক নিয়ম ও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়—তখন মানুষ নিজেরাই ভুক্তভোগী হয়।

পরিবারে নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা ঐতিহ্যগতভাবে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও এতকাল ধরে চলে এসেছে। অথচ বর্তমান দুনিয়ার একটি ট্রেন্ড

(চল) হলো এই পার্থক্যকে দূরীভূত করা। বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র ভূমিকাকে বিলুপ্তির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ‘ইকুয়ালিটি’ বা সাম্য ও সমতার নামে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে পুরুষের সাথে ‘সমানভাবে’ অংশগ্রহণ করতে। মাতৃত্বের মহান দায়িত্বকে অবহেলার চোখে দেখা হচ্ছে। মাতৃত্ব অপেক্ষা বাড়ির বাইরে ক্যারিয়ার গঠনকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এমনকি মুসলিম ভূমিগুলোতেও কাফিরদের অনুকরণে এই ট্রেন্ড মহামারি হয়ে দেখা দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের যে পৃথক ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন সেই ভারসাম্য নষ্ট করার যে অপচেষ্টা চলছে—এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের সাবধান থাকা উচিত।

মাতৃত্বের সুমহান ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃত্ব অত্যন্ত সম্মানজনক একটি দায়িত্ব। এর মাধ্যমে একজন নারী প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পুরস্কার লাভ করতে পারে। নবিজির একটি সুপরিচিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘একব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ সে বলল, ‘অতঃপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার বাবা।’^[৩০] এই হাদীসের মাধ্যমে মাতৃত্বের গুরুদায়িত্বের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। দুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান ও দামি কাজ হলো মায়ের ভূমিকা পালন করা। কেননা, একজন মায়ের হাতেই পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে ওঠে। এভাবে একজন মা একটি মজবুত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। সন্তানের যত্ন নেওয়া, তাকে বড় করা, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া ও সন্তানের জীবনের নানান দিক-নির্দেশনা দিয়েই একজন মায়ের জীবনটা কেটে যায়। এ কারণে মায়ের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি—যার তিনি যোগ্য দাবিদার।

এই দায়িত্বগুলো আল্লাহ তার অসীম রহমত ও হিকমাহ অনুসারে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন একশোটি রহমতও সৃষ্টি করেন। প্রতিটি রহমতই আসমান ও জমিনের মাঝখানে মহাশূন্যের মতো বড়। তন্মধ্যে একটি রহমত তিনি পৃথিবীতে দিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে মা তার সন্তানকে স্নেহ করে...’^[৩১] এ কারণে আল্লাহ নারীদেরকে কিছু অনন্য গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ভূষিত করেছেন যার মাধ্যমে সে সফলতার সাথে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে। নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই অধিক যত্নশীল, মমতাময়, সংবেদনশীল এবং ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। এ-সকল চারিত্রিক গুণের মাধ্যমে একটি উষ্ণ, প্রেমময় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় সমস্ত ঘর জুড়ে!

[৩০] বুখারি : ৫৯৭১ ও মুসলিম : ২৫৪৮।

[৩১] মুসলিম : ২৭৫৩।

মাতৃত্ব একটি ফুলটাইম ক্যারিয়ার। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, সন্তান জন্মদান, সন্তানকে দুধ পান করানো, শৈশবের বছরগুলোতে তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করা—সবকিছুই মাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্বগুলোই একজন ব্যক্তির জন্য অনেক। কিন্তু এর সাথে যদি পরিবারের আর্থিক জোগানের কাজটাও সেই মায়ের উপর বর্তায়, তা হলে এটি একটি অতিরিক্ত বোঝা। তাই বাড়ির বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করার দায়িত্বটা আল্লাহ পুরুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন, নারীর জন্য নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত। কেননা, যদি এই বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তারা সহ্য করতে পারত না। সাধারণ পরিস্থিতিতে নারীরা ঘরে কাজ করার মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো উত্তমরূপে আদায় করতে পারে।

নারীর কর্মক্ষেত্র

মা হওয়ার মাধ্যমে একজন নারীর জন্য ঘরের বাইরে কাজ করার সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায় না। যে মায়ের ছোট সন্তান রয়েছে এবং বাইরে কাজ করার কোনো জরুরি প্রয়োজন নেই, তার জন্য বাড়িতে অবস্থান করা উত্তম। মা হিসেবে বাড়িতে থেকে সাধ্যমত নিজের দায়িত্ব পালন করা উত্তম। একজন মুসলিম নারীকে অবশ্যই এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করার মাধ্যমেই সে আল্লাহর কাছ থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করতে পারবে। পরিবার গড়ে তোলার বিষয়টি অন্য সবকিছুর উপরে প্রাধান্য পাবে। এটিই নারীদের প্রধান বাধ্যবাধকতা। এ বিষয়টি সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখা উচিত।

যদিও কিছু ব্যতিক্রম পরিস্থিতি রয়েছে যখন একজন মা বাড়ির বাইরে কাজ করতে পারেন। যেমন : পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সহায়তা প্রদান করা অথবা সামাজিক চাহিদা পূরণ করা (উদাহরণস্বরূপ : নারী ডাক্তার, ধাত্রী, নারী শিক্ষক ইত্যাদি)। তবে সামাজিক দায়িত্ব পূরণের এই বিষয়গুলো হলো সমষ্টিগত বাধ্যবাধকতা (ফরযে কিফায়া) যা সমাজের কিছু মানুষের মাধ্যমে আদায় হলে বাকি সকলের জন্যেই আদায় হয়ে যায়। তখন সেটা আর বাধ্যতামূলক থাকে না। তবে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই একজন নারীকে নিজের লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটি স্মরণ রাখা খুবই জরুরি যে, ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা পূরণ করা (ফরযে আইন) সমষ্টিগত বাধ্যবাধকতা পূরণের চেয়ে প্রাধান্য পাবে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, নারীদের কাজ করা সর্বাবস্থায় হারাম নয় কিন্তু ধর্তব্য বিষয় হলো এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, আলাপ আলোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে কিছু গাইডলাইন ও চেকলিস্ট অনুসরণ করতে হবে :

১. নারীকে অবশ্যই প্রথমে তার স্বামীর সম্মতি-গ্রহণ করতে হবে। কেননা স্ত্রীর কাজে

যোগদানের মাধ্যমে পরিবারের কার্যক্রম কীভাবে প্রভাবিত হবে এই বিষয়ে স্বামীর অধিকতর বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে।

২. কাজে যোগদানের পূর্বে নারীকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, তার নিজের ঘর ও সন্তানদের সঠিক যত্ন নেওয়া হচ্ছে কি না। সেখানে কোনো অবহেলা করা যাবে না। তার অনুপস্থিতির কারণে পরিবারের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
৩. সতর্কতার সাথে এমন কাজ নির্বাচন করতে হবে যা নারীদের প্রকৃতিগত স্বভাব এবং ইসলামি আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
৪. ইসলামের সীমানা লঙ্ঘনের আশঙ্কা রয়েছে এমন কর্মক্ষেত্র ও পেশা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যেতে হবে (যেমন : ফ্রি মিক্সিং, নারী-পুরুষের অত্যধিক মেলামেশা)।
৫. তার পোশাক এবং আচার-আচরণ অবশ্যই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

পিতৃত্বের ভূমিকা

স্বামীর দায়িত্ব হলো পরিবারের সদস্যদের জন্য, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করা। এর মধ্যে রয়েছে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা। সাধারণভাবে তিনি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতার জন্যও দায়িত্বশীল। এর মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপদে রাখা অন্তর্ভুক্ত। এই গুরুত্বের প্রতি অবহেলা করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘একজন ব্যক্তির জন্য এতটুকু গুনাহই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে অবহেলা করে যাদের প্রতি অর্থ খরচ করা বাধ্যতামূলক।’^[৩২]

এই দায়িত্বের কারণে পিতা পরিবারের কর্তা এবং প্রধান ব্যক্তি। ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক ব্যতীত যেভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারে না, তেমনিভাবে পিতা পরিবারের প্রধান হিসেবে তাদের দেখভালের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ কারণে তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছে আনুগত্যের হকদার এবং সকল সিদ্ধান্তে তিনি চূড়ান্ত বক্তব্য প্রদান করবেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কোনো আপস করবেন না বা কোনো আলোচনা করবেন না, বরং এর অর্থ হলো তিনি সম্মান ও আনুগত্যের যোগ্য।

মায়ের পাশাপাশি পিতাও সন্তানদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক বিষয়গুলো দেখভাল করবেন। তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন সন্তানরা যথোপযুক্ত ইসলামি শিক্ষা লাভ করে। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সঠিক আদব-কায়দা শেখাতে তিনি তাদেরকে সহায়তা করবেন।

অর্থাৎ, প্রয়োজন অনুসারে তিনি অবশ্যই সন্তানদের পরিচর্যা, লালন-পালন ও

[৩২] আবু দাউদ : ১৬৯২, সহীহ।

তারবিয়াহ (প্রশিক্ষণ) প্রদান করবেন। অনেক পিতা এই দায়িত্বগুলোর প্রতি উদাসীন। কেবল সন্তানদের শারীরিক প্রয়োজন তথা খাদ্যের চাহিদা মিটিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন! একটি পরিবারকে কার্যকর রাখতে আলোচ্য সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যিক।

মায়ের সাথে যেভাবে সন্তানদের মেলামেশা ও সময় কাটানো প্রয়োজন, সেভাবে পিতার সাথেও সময় কাটানো জরুরি। ছেলেশিশুদের বিকাশের জন্য এ বিষয়টি আরও বিশেষভাবে দরকার। কেননা, তাদের জন্য একটি উপযুক্ত পুরুষ রোল মডেল প্রয়োজন। সন্তানের বিকাশের জন্য সক্রিয়ভাবে পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করাই একজন পুরুষের মূল দায়িত্ব। সন্তান যেন বুঝতে পারে যে তাদের পিতা তাদেরকে ভালোবাসেন ও যত্ন নেন। তিনি তাদের কল্যাণের কথা ভাবেন। সন্তানদের জন্য একজন মুসলিম পিতা হলেন অনুপ্রেরণাদায়ী রোল মডেল, শিক্ষক, বন্ধু এবং যে-কোনো প্রয়োজনে উত্তম পরামর্শদাতা।

সন্তানদের বিকাশে পিতার ভূমিকা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। Us National Institute of Child Health and Human Development কর্তৃক ‘সন্তানের বিকাশে পিতৃত্বের প্রভাব’-শীর্ষক একটি রিভিউতে দেখা গেছে, যে সন্তান পিতার সক্রিয় সংস্পর্শে বেড়ে ওঠে তার সামাজিক দক্ষতা অন্যদের থেকে বেশি থাকে। যখন সে নার্সারিতে পৌঁছায়, পড়ালেখায় অন্যদের থেকে ভালো করে এবং ভবিষ্যতে তার মধ্যে যে-কোনো আচরণগত ত্রুটি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পাঠক! আরও একবার ইসলামের চিরায়ত শিক্ষার সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মিল পাওয়া গেল।

নিজের ঈমান বিকশিত করা

বাবা-মা যদি তাদের সন্তানদের মাঝে ঈমান পরিচর্যার এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে চায় তা হলে প্রথমে নিজেদের ঈমান পরিচর্যায় মনোযোগী হতে হবে। এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে যে কোর্স আমরা কমপ্লিট করতে যাচ্ছি তা শুধুমাত্র শিশুদের উপর প্রযোজ্য নয়। বরং, যারা এই বইটি পড়ছেন তাদের জন্যও প্রযোজ্য। বাস্তবে এটিই আমাদের চলমান কোর্সের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগ-যুগ-ধরে-চলে-আসা একটি মৌলিক নীতি হলো, আমরা অপরকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে নিজেরাই সবচেয়ে বেশি শিখে থাকি। সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে এই অমূল্য শিক্ষার সুযোগ লাভ হয়। শিশুকে শেখাতে গিয়ে নিজের ঈমান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যমেও পিতা-মাতাকে নিজের ঈমান বিকাশের প্রচেষ্টা চালাতে হবে; যেমন- ইলম অর্জন করা, ইবাদাত বৃদ্ধি করা, দান-খয়রাত করা, মুসলিম সমাজের উপকার করা ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর ঈমানের পরিচর্যা, যত্ন ও বিকাশ অনেক সহজ হয়ে যায়।

সন্তানের মৌলিক অধিকার (পিতা মাতার দায়িত্ব)

এবারে আমরা শিশুদের কিছু মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করছি যা পিতা-মাতার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

১. শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রদান করা ও প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা

এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি। শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দিক থেকে শিশু যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই কার্যক্রমের সূচনা ঘটে গর্ভধারণ থেকে। গর্ভাবস্থা থেকে সন্তান প্রসব করার পর, শৈশব থেকে শুরু করে শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এটি চলমান থাকে।

২. ভালোবাসা ও মায়া-মমতা লাভের অধিকার

শিশুদের বিভিন্ন মানসিক প্রয়োজন রয়েছে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা, মায়া-মমতা এবং তাদেরকে সঙ্গ দেওয়া। এটি সন্তান প্রতিপালনের একটি মৌলিক দায়িত্ব। শিশুকে আদর করা, কোলে নেওয়া, চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা, মিষ্টি কথা বলা এবং একত্রে সময় কাটানো কার্যকর প্যারেন্টিং-এর জন্য খুব জরুরি। শিশুর ভাল শুধরে দেওয়া ও শাসনের পূর্বে এই বিষয়টি খেয়াল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. পিতৃ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার

নিজের বংশ এবং পিতা-মাতার পরিচয় জানা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। এ কারণে বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতা সুরক্ষিত রাখতে হয় এবং বিবাহ বহির্ভূত উপায়ে বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণ হারাম। পিতৃ-পরিচয় গোপন করে শিশু দত্তক নেওয়া ইসলামে হারাম।^[৩৩] শিশু তার পিতার নামে পরিচিত হবে। ইসলামি আইনের মাধ্যমে শিশুর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত হয়।

৪. উপযুক্ত শিক্ষা লাভের অধিকার

শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক ও দ্বীনের তারবিয়াহ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)। কারণ এটাই হলো সকল শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা (এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। এই শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ইসলামি শিক্ষা, ঈমান-আকীদা এবং তাওহীদের শিক্ষা। চাহিদা মতো ‘দুনিয়াবি’

[৩৩] সেই ধরনের দত্তক নিষিদ্ধ যখন শিশুর প্রকৃত পারিবারিক নাম, পিতৃ-পরিচয়, বংশ ইত্যাদি গোপন/অপসারণ করা হয় এবং দত্তক নেওয়া পরিবারের সাথে মিলিয়ে নতুন নাম প্রদান করা হয়, প্রকৃত জন্মদাতার পরিবর্তে পালক পিতার নামে পরিচয় প্রদান করা হয়। এ ধরনের দত্তক ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও ইয়াতীম শিশুদের লালন পালন করা, নিজের প্রকৃত সন্তানদের সাথে একত্রে রেখে বড় করা, তাদেরকে একইভাবে ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ নয় বরং উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস অনুসারে, ইয়াতীম শিশুদের দয়া, মমতা ও সমতা-সহকারে বড় করাকে খুবই প্রশংসনীয় আমল বলা হয়েছে, যার পুরস্কার হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব, পালক পিতা-মাতাদেরকে এই বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।—মূল বইয়ের সম্পাদক

শিক্ষা এবং তথ্য দিয়েও শিশুকে শিক্ষিত করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই শিশুর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা বিকশিত হয়।

পিতা-মাতার মৌলিক অধিকার (সন্তানের দায়িত্ব)

সন্তানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা পিতা-মাতার ক্ষেত্রে অধিকার বলে বিবেচ্য :

১. সম্মান ও আনুগত্য লাভের অধিকার

সাধারণত পিতা-মাতা সে-সকল আদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেন যাতে সন্তানের কল্যাণ নিহিত। ফলে সকল অবস্থায় ওই সকল আদেশের প্রতি অনুগত থাকা এবং পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা সন্তানের দায়িত্ব। পিতা-মাতার অবাধ্যতা, তাদের কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করা কিংবা নিজের খেয়ালখুশিমতো চলা উচিত নয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, যদি পিতা-মাতা আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে সন্তানকে আদেশ করে তা হলে পিতা-মাতার কোনো আনুগত্য করা চলবে না।

২. সমালোচনা ও তিরস্কার করার অধিকার

যে-কোনো ক্ষতি থেকে নিজের সন্তানকে রক্ষা করা পিতা-মাতার জন্য বাধ্যতামূলক। যদি সন্তান কোনো খারাপ কাজের প্রতি প্রলুব্ধ হয় তবে তাকে রক্ষা করাটা পিতা-মাতার দায়িত্ব। প্রয়োজন অনুসারে তারা সন্তানকে উপদেশ দিবেন, আলোচনা করবেন, ভুল শুধরে দিবেন কিংবা তিরস্কার ও বকাঝকাও করবেন। এক্ষেত্রে সন্তান যেন পিতা-মাতার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে কথা কাটাকাটি বা তর্কে জড়িয়ে না পড়ে। (আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে না হলে) পিতা-মাতার উপদেশ অবশ্যই শুনতে হবে এবং মানতে হবে, যদিও সেটা সন্তানের ইচ্ছার বিপরীত হয়।

৩. নম্র কথা ও উত্তম আখলাক লাভের অধিকার

আল্লাহ বলেছেন,

وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

‘আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিল। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে...’

(সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٥٩﴾

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বোলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা-সহকারে কথা বোলো।’ (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩)

এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে সম্ভানদেরকে পিতা-মাতার প্রতি মিষ্টিভাষী, নম্র ও শ্রদ্ধাশীল এবং সদয় হতে আদেশ করা হয়েছে। সম্ভানদের প্রতি পিতা-মাতা যে অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো যেন তারা ভুলে না যায়। সম্ভানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ, ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিদান হিসেবে তাদের প্রতি উত্তম শিষ্টাচার ও সদয় আচরণ করতে হবে। এই আয়াতের নির্দেশের মধ্যে ধৈর্যশীলতা, মায়া-মমতা, রহমত, কৃতজ্ঞতা, বিনয় ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

৪. সাহায্য লাভের অধিকার

সম্ভানদের উচিত ঘরের কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং সক্ষম হলে অন্যান্য দায়িত্ব ভাগাভাগি করা। উদাহরণস্বরূপ ছোট ভাই বোন থাকলে তাদেরকে দেখাশোনার কাজে সহায়তা করা উচিত। যখন পিতা-মাতা বার্ষিক্যে উপনীত হবেন তখন অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করতে হয়।

৫. সেবায়ত্ন লাভের অধিকার

প্রাপ্তবয়স্ক সম্ভানসম্ভতিদের কর্তব্য হলো বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবায়ত্ন করা। শৈশবে তারা সম্ভান লালন-পালন করতে কষ্ট করেছেন। তাই বৃদ্ধ অবস্থায় পিতা-মাতার দৈহিক, অর্থনৈতিক, মানসিক প্রয়োজন এবং নিঃসঙ্গতা দূর করতে সাহায্য করা জরুরি। পিতা-মাতা যেভাবে শৈশবে দুর্বল সম্ভানদের দেখাশোনা ও যত্ন করেছেন সেভাবে পিতা-মাতা বার্ষিক্যে উপনীত হলে সম্ভানদেরও উচিত সেভাবেই পিতা-মাতার দেখাশোনা করা। পিতা-মাতার সেবায়ত্ন করার বিষয়টি সাম্য, উদারতা ও ইহসানের ভিত্তিতে বুঝতে হবে।

শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর গুরুত্ব, শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَيِّمَ الرِّضَاعَةَ

‘যে তার সম্ভানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু-বছর নিজেদের সম্ভানদের দুধ পান করাবে। ...’ (সূরা বাকারাহ ২ : ২৩৩)

শিশুকে বুকের দুধ পান করানো নারীদের গর্ভাবস্থার একটি বর্ধিত অংশ। বিভিন্ন গবেষণায় এ বিষয়টি বহুবার উঠে এসেছে যে, বুকের দুধই শিশুর জন্য সবচেয়ে উপকারী। এর বৈচিত্র্যময় শারীরিক উপকারিতা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। বুকের দুধ পান করানোর মাধ্যমে মা ও শিশু উভয়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে উপকার লাভ করেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘বন্ডিং’ (বন্ধন) বা ‘অ্যাটাচমেন্ট’। এটি সন্তান প্রতিপালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রভাবক। একারণে ইসলামে বুকের দুধ পান করানোর প্রতি দারুণভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত এটি শিশুর মৌলিক অধিকার।

শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের দিনগুলো মা ও শিশু উভয়ের জন্য খুবই সংবেদনশীল সময়। তখন মা ও শিশু উভয়ে পরস্পরের নিবিড় সাহচর্যে থাকতে চায়। এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে মায়ের সংস্পর্শে থাকার শিশুর চাহিদা এবং মায়ের পক্ষ থেকে শিশুকে যত্ন নেওয়ার চাহিদা পূরণ হয়। দুজনেই এক্ষেত্রে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে মায়ের প্রতি শিশুর চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং মা শিশুর সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। শিশুকে কাছে রেখে বুকের দুধ পান করানোর মাধ্যমে উভয়ের এই চাহিদা পূরণ হয়।

পারস্পরিক এই নিবিড় সাহচর্যের একটি প্রধান উপকারিতা হলো শিশু পরিচর্যাকারীর প্রতি নির্ভর করতে শেখে। আশেপাশে থাকা বড় মানুষদের উপর তার আস্থা তৈরি হয়। সে বুঝতে পারে যে তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করা হবে এবং এই পৃথিবী একটি নিরাপদ স্থান। শিশু আরও বুঝতে পারে যদি সে কান্না করে তা হলে কেউ না কেউ সাড়া প্রদান করবে। আর তাই নিজের কোনো অসুবিধা হলে বাকিদেরকে কান্নার মাধ্যমে সিগন্যাল প্রদান করে। শিশুর এই কান্নার সিগন্যালে সবার আগে ছুটে আসেন মা, কারণ তিনিই সবসময় শিশুর পাশে থাকেন। এভাবে মা ও শিশুর মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মা ও শিশুর পারস্পরিক এই বোঝাপড়ার কারণে প্যারেন্টিং-এর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। শিশু অন্যদের উপরেও নির্ভর করতে শেখে। শৈশবের এই নিবিড় বন্ধন ও ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক হয় প্রাণবন্ত এবং সহজ-স্বাভাবিক।

পিতা-মাতার নিবিড় সাহচর্যের মাধ্যমে শিশু স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে। তাদের তত্ত্বাবধানে থাকার মাধ্যমে সে পরনির্ভরতা ও স্বাধীনতার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য নির্ণয়ে উৎসাহিত হয়। শিশু নিজেকে নিরাপদ মনে করে কারণ তার পিতা-মাতা তাকে সাহায্য করার জন্য তার নিকটেই রয়েছেন। ফলে সে নিরাপদে আশেপাশের পরিবেশে কোথায় কী আছে সবকিছু ঘুরে দেখে, ব্যবহার করতে শেখে। উদাহরণস্বরূপ; বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে, হামাগুড়ি-দেওয়া শিশুদের মধ্যে যারা মায়ের নিরাপদ সাহচর্যে থাকে তারা

নতুন পরিবেশ ও খেলাধুলার সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে ও স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করে। যখন শিশু বড় হতে থাকে তখন শৈশবের বন্ধন ও সাহচর্য শিশু এবং পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শৈশবের সূচনা ও মধ্যম পর্যায়ে এর নানা রকম উপকারিতা দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধন থাকলে পিতা-মাতা সন্তানকে সহজে ভুলত্রুটি শুধরে দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তানকে শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেওয়াতে পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

নেক সন্তানের জন্য দুআ করা

নেক সন্তানের জন্য মুসলিম পিতা-মাতার সর্বদা দুআ করা উচিত। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّعِينَ إِمَامًا ﴿١٩﴾

‘তারা প্রার্থনা করে থাকে, “ হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের চক্ষু-শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।’
(সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)

সন্তান যেন নেককার, দীনদার এবং চক্ষু শীতলকারী হয় সেজন্য পিতা-মাতার দুআ করা উচিত। নেক সন্তান পিতা-মাতার সুখের কারণ। তারাও নিজেদের দুআর মাধ্যমে পুরস্কৃত হবেন এবং সন্তানকে ইসলামের উপর বড় করার জন্য যত কষ্ট করেছেন সবকিছুর বিনিময় লাভ করবেন। নবীরাও তাদের সন্তানের জন্য দুআ করেছেন। যাকারিয়া আল্লাহিস সালাম এই দুআ করেছেন,

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٢٥﴾

‘সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩৮)

ইবরাহীম আল্লাহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন এভাবে,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣١﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

‘হে আমার রব! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও। (এ দুআর জবাবে)
আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।’ (সূরা সাফফাত, ৩৭ :
১০০-১০১)

স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক একান্ত ঘনিষ্ঠতার পূর্বে আল্লাহর কাছে অনাগত সন্তানের সুরক্ষা চেয়ে দুআ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর কাছে আসে, তবে সে বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

‘আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আমাদের কাছ থেকে শয়তানকে সরিয়ে দাও! আমাদেরকে যা দেবে, তা থেকে শয়তানকে দূর করে দাও!’ অতএব এ মিলনের ফলে যদি তাদের কোনো সন্তান জন্ম নেয় তবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’[৩৪]

এই দুআ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সন্তান প্রতিপালন শুরু হয় গর্ভধারণেরও আগে থেকে! যখন স্বামী স্ত্রী পরস্পরের একান্ত সময়ে নিজেদের সুরক্ষার জন্য এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে অনাগত সন্তানের সুরক্ষা চেয়ে আল্লাহর কাছে যখন দুআ করেন, তখন থেকেই সন্তান প্রতিপালনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সারা জীবন ধরে সন্তানের জন্য দুআ চলতে থাকে। কখনও এমন কিছু কঠিন পরিস্থিতি আসে যখন পিতা-মাতা বুঝতে পারেন শুধুমাত্র দুআ এবং আল্লাহর ইচ্ছার মাধ্যমেই সেখান থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য! মুসলিম হিসেবে সর্বাবস্থাতেই আমাদের জন্য আশা ও ভরসার এই দরজাটি উন্মুক্ত থাকে!

ইলম ও শিক্ষালাভ

নিচের স্তরের লোকদের অবস্থা দেখো, উপরের স্তরের লোকদেরকে দেখো না। কেননা আল্লাহর নিয়ামাতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা।^[৩৫]

ইলমের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম অর্জন করা ফরয।’^[৩৬] যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন থেকেই এই দায়িত্বের সূচনা এবং এটা আমৃত্যু কার্যকর থাকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথকে সুগম করে দেন।’^[৩৭] অন্যান্য সৃষ্টির বিপরীতে মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তাদেরকে নতুন নতুন বিষয় জানা ও বোঝার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। এর সাথে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদি মানুষকে নতুন বিষয় শেখা ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা ছাড়াই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হতো—তবে একটি বিপর্যয় তৈরি হয়ে যেত।

ইলম এবং ইলম অন্বেষণের মাধ্যমে আমরা জীবনের সত্য ও সরল পথ খুঁজে পাই। জরুরি ইলম বাদ দিয়ে এই দুনিয়ার জীবনে সফলতা লাভ করা যায় না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

...আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।’ (সূরা ফাতির,

[৩৫] তিরমিযি : ২৫১৩, সহীহ।

[৩৬] ইবনু মাজাহ : ২২৪; বায়হাকি : ১৬৬৪; হাসান।

[৩৭] মুসলিম : ২৬৯৯।

৩৫ : ২৮)

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظْرِنَهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴿٣٥﴾

‘এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দিই: কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৩)

فَلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾

‘...বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করো।’ (সূরা যুমার ৩৯ : ৯)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।’^[৩৮] তিনি আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। আর ফেরেশতারা তালিবে ইলমদের (ইলম অর্জনরত ছাত্রদের) জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে যা-কিছু আছে এমনকি পানিতে মাছও আলিমের মাগফিরাতের জন্য দুআ করে।

আবিদের (ইবাদাতকারীর) ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমগ্র তারকামণ্ডলীর ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। অবশ্যই আলিমগণ হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী। আর নবিগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দিনার রেখে যান না। তবে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইলম (জ্ঞান) রেখে যান। কাজেই যে ব্যক্তি তা আহরণ করেছে সে পুরো অংশই লাভ করেছে।’^[৩৯] আরও গুরুত্বের সাথে অন্যত্র বলেছেন, ‘দুজন ব্যক্তি ছাড়া আর কারও প্রতি ঈর্ষা-পোষণ করা যায় না। এক ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন। আরেক ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও (অপরকে) তা শিক্ষা দেয়।’^[৪০]

নিজে ইলম অর্জন করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম হলো জ্ঞানের ধর্ম। ইলমের সাথে অনেক উপকারিতা ও ফযীলত সম্পর্কযুক্ত। মানুষ যে-সকল বিষয় অর্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করতে পারে তার মধ্যে অন্যতম মহান লক্ষ্য—ইলম অর্জন করা। আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করা জরুরি এবং ইলম ছাড়া কোনো আমল নেই।

[৩৮] বুখারি : ৭১; মুসলিম : ১০৩৭।

[৩৯] আবু দাউদ : ৩৬৪১; তিরমিযি : ২৬৮২।

[৪০] বুখারি : ১৪০৯।

ইলম এর অর্থ কী?

অধিকাংশ মুসলিমরা ইলম অর্জনের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবগত নয়। ইলম অর্জনের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যেন নবিজির উল্লেখিত হাদীসে সব ধরনের ইলমকে বোঝানো হয়েছে—দীন দুনিয়া নির্বিশেষে! সবকিছু মিলিয়ে একটি বড় ক্যাটাগরি কল্পনা করা হয়। আজকাল অনেকে বলতে শোনা যায়, ‘প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম অর্জন করা ফরয, এজন্য আমি আমার ছেলে-মেয়েদের একটি সেকুলার হাইস্কুল বা কলেজে পড়াতে চাই!’ সাধারণ দৃষ্টিতে এ কথাকে নির্দোষ মনে হয় কিন্তু বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বক্তব্যে অনেক দুর্বলতা ফুটে ওঠে।

ইলমের আলোচনা প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম দুই ধরনের ইলমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। একটি ইলম হচ্ছে যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অর্জন করা বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) এবং আরেক ধরনের ইলম হচ্ছে ফরযে কিফায়া যা সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে থাকলেই বাকিদের জন্য যথেষ্ট। প্রথম ধরনের ইলম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অর্জন করা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান, আকীদা, ঈমান এবং ইসলামের বিভিন্ন ফরয আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইলম, যেমন : সালাত, সিয়াম, যাকাত, সামাজিক সম্পর্কের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমষ্টিগত আমলের জ্ঞান ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধরনের ইলম (যা ফরযে কিফায়া) সমাজের কিছু-সংখ্যক মানুষের মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক। সবার মধ্যেই থাকতে হবে এটা জরুরি নয়। যদি কিছু মানুষ সেই ইলম অর্জন করে তা হলে বাকিদের জন্য সেটা অর্জিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন বাকিদের জন্য সেটা আর বাধ্যতামূলক থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি সমাজের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তির ডাক্তারি-বিদ্যা জানা থাকে এবং তাদের মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তিদের যত্নস্বত্তি নেওয়া সম্ভব হয় তা হলে বাকিদের জন্য সেটা আর বাধ্যতামূলক থাকে না। কিন্তু যদি একজনও চিকিৎসক না থাকে তা হলে পুরো সমাজের সবাই আক্রান্ত হয় এবং তাদের উপরে ডাক্তারি ইলম অর্জন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। জরুরি বিষয় বাদে ইসলাম ও শারীআ সম্পর্কে বিস্তারিত ইলম অর্জন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়গুলো এই ক্যাটাগরিতে চলে আসে।

ইলম অর্জনের বাধ্যবাধকতা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশেষভাবে দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব প্রদান করেছেন। '

এ বিষয়টি আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ থেকে বুঝতে পারি। কাজেই যে ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক তার মধ্যে রয়েছে; প্রথমত, আল্লাহ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা, তাঁর গুণবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা, সৃষ্টির উপর আল্লাহর হক কী, সেগুলো জানা, কীভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি সেই পথ সম্পর্কে জানা, আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা এবং আখিরাতের

পরিণতি সম্পর্কে অবগত থাকা ইত্যাদি। সারকথা হলো যে ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক তার মধ্যে ঈমানের মূলনীতিসমূহ এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এই ইলমকে অবশ্যই দুনিয়াবি ইলমের উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা, দ্বিনি ইলমের কার্যকারিতা ৬০-৭০ বছরের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনন্তকাল সেটা কার্যকর থাকবে।

ইলম এবং পিতা-মাতার ভূমিকা

ইলম অর্জনে পিতা-মাতার গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিশেষত যারা মনে করেন নিজেদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত করার তেমন গুরুত্ব নেই! আমরা কিছু আগেই উল্লেখ করেছি ইলম অর্জন করা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। পিতা-মাতার একটি মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের দেখভাল করা। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সব ধরনের চাহিদা পূরণে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। এর মাধ্যমে আমরা শক্তিশালী মুসলিম প্রজন্ম তৈরি করতে পারি। পরিবার গঠনে ও সন্তানের বিকাশে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে এ বিষয়টি তাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িতে পাঠচক্র বা ঘরোয়া মজলিস, তালীম কিংবা মাসজিদে ইলমের হালাকায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। তবে বাড়ির মানুষদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। যেমন ‘মডেলিং এন্ড অবজারভেশন’ (দেখে শিখা) পদ্ধতি। মা যেহেতু বাড়ির সকল সদস্যদের সাথে সব অবস্থায় সংযুক্ত থাকেন তাই তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষকের ভূমিকায় আবির্ভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান এবং হিকমাহ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীরা পরিবারে এক অসাধারণ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ দেখে সবকিছু শেখে। বিশেষ করে তারা নিজের পিতা-মাতার আচার-আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যে কন্যাশিশু নিয়মিত তার মাকে পর্দা করতে দেখে, বোরকা বা হিজাব পরতে দেখে, কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখে, সময়মত সালাত আদায় করতে দেখে—সেই শিশুর জন্য এগুলো স্বাভাবিকভাবেই পালন করা খুব সহজ। এর জন্য তাকে কোনো বাড়তি কষ্ট বা সংগ্রাম করতে হয় না। কিন্তু যে শিশু কখনও নিজের বাড়িতে কাউকে সালাত আদায় করতে দেখেনি, কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেনি, অন্য কোনো ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান দেখেনি—তার কাছে এগুলো পালন করা কষ্টকর। ‘মডেলিং এন্ড অবজারভেশন’ খুবই শক্তিশালী প্রভাবক এবং এই ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানকে সুশিক্ষিত করতে বাবা’র ভূমিকাও খাটো করে দেখা চলবে না। বাবাদেরও শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং বাড়িতে একটি ইসলামি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে মাকে সহায়তা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে নিয়মিত ইলম অর্জনে উৎসাহিত করবে,

পরস্পরের সাথে নিজেদের ইলম শেয়ার করবে। কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদীস ও ইসলামি গ্রন্থ পাঠ করা, নিয়মিত ইসলামি আলোচনা ও স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন মজলিস ও ওয়াজ-মাহফিল এবং নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে ইসলামি কন্টেন্ট ডাউনলোড করা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি পরিবারের ঘামী-স্ত্রী নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ অব্যাহত রাখতে পারেন। এর মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কও আরও মজবুত ও ঘনিষ্ঠ হয়।

ইলম এবং সন্তান প্রতিপালন

প্যারেনটিং (সন্তান প্রতিপালন), এডুকেশন (শিক্ষা) এবং লার্নিং এই বিষয়গুলো অবশ্যই ইসলামি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। দ্বীনের মৌলিক বিষয় শিক্ষাকে সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দিতে হবে কারণ এটা ফরযে আইন। একজন মুসলিম শিশুর জীবনের শুরু থেকে ইসলামি ইলমের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিতে হবে। তার তথ্য সংগ্রহ, জানাশোনা, চিন্তা ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। কুরআন-হাদীস, সীরাহ, আরবি ভাষা ইত্যাদি যেন তার দৈনিক খাদ্য গ্রহণের মতো নিয়মিত বিষয় হয়। এমনকি যখন সে বিছানায় ঘুমোতে যাবে তার আগে যেন তার সাথে ইসলামি গল্প ও ঘটনাগুলো আলোচনা করা হয়। নবি-রাসূলদের ইতিহাস, সাহাবিদের ঘটনা এবং নেক ব্যক্তিদের চমকপ্রদ শিক্ষণীয় ঘটনাসমূহ তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

জ্ঞানের অনেক শাখা রয়েছে। জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলো যদি সে শিখতে চায় তা হলে সেগুলো অবশ্যই এই ভিত্তির উপরেই শিখবে। বাস্তবে যে-কোনো দুনিয়াবি ইলমকে ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ; কীভাবে একজন ব্যক্তি বিজ্ঞান (সাইন্স) শিখবে, যদি-না সে বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রজ্ঞা, কুদরত, নিখুঁত সৃষ্টির সামঞ্জস্য খুঁজে পায়! এই বিশ্ব-জাহান তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং কুরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়ের সাথে যদি সম্পর্ক খুঁজে না পায় তা হলে সে কীভাবে বিজ্ঞান শিখবে? একইভাবে, একজন শিক্ষার্থী ব্যবসা শিখতে পারে না, যদি সে অর্থনীতি, ফিন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি না বোঝে। যদি কেউ সাইকোলজি (মনোবিজ্ঞান) পড়তে চায় তা হলে শুরুতেই অবশ্যই তাকে জানতে হবে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কী কী তথ্য প্রদান করেছেন। কারণ তিনি আমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন, এমনকি আমাদের নিজেদের থেকেও তিনি আমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে-সকল দুনিয়াবি শিক্ষা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। এই তথ্য সন্তানদের বোঝাতে হবে। (ইসলাম-বিমুখ) দর্শনশাস্ত্র (ফিলসফি) এবং নানারকম আর্টস (কলাবিজ্ঞান)-এর বিষয়গুলো শেখা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ সেগুলো ইসলামের শিক্ষার সাথে সুস্পষ্টভাবে

সাংঘর্ষিক। এভাবে সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মানদেয়কে পাঠানোর মাধ্যমে তাদেরকে একটি বড় বিপদের মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কারণ সেখানে বিকৃতভাবে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হয় এবং নানা রকমের বিজাতীয় ও বিধর্মী আচার অনুষ্ঠান শেখানো হয়। এমনকি সেসব স্কুল কলেজে শেখানো হয় যে ‘ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার’ এবং এসব জ্ঞানের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এ-সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিষয়কে খুব অল্প গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রে মোটেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে উপহাস করা হয় এবং অবমূল্যায়ন করে ত্রুটিপূর্ণভাবে শেখানো হয়।

দুনিয়ার বস্তুগত বিষয়গুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। কেননা, নিজেদের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া ইসলামের অংশ। উদাহরণস্বরূপ; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিয়মিত দুআ করে বলতেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও।”[৪১]

বিজ্ঞান, গণিত কিংবা অন্যান্য বিষয় শেখা গ্রহণযোগ্য যদি সেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কিন্তু আখিরাতে জীবনকে বিক্রি করে দুনিয়ার জীবনে মনোযোগী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেছেন,

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

‘যা-ই তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ-মাত্র, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী। তা সেইসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর ভরসা করে।’ (সূরা শূরা, ৪২ : ৩৬)

ইলম অর্জনের থেকেও বেশি কিছু

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে জ্ঞান অর্জন করাই আমাদের একমাত্র অপরিহার্য কাজ নয়। সকল জ্ঞান অর্থহীন যদি সেগুলোর সাথে ঈমান, তাকওয়া, ইখলাস এবং আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের কোনো সম্পর্ক না থাকে। পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী মানুষ রয়েছেন কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করে না। তারা ভুলের উপর চলছে। ইলম

[৪১] বুখারি : ৬৩৮৯; মুসলিম : ২৬৯০।

অশ্বেষণের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারব কোন পথ আমাদের অনুসরণ করতে হবে, কোন পথে বিপদ-আপদ ঘাপটি মেরে আছে আর কোন পথ আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে। আমরা আমাদের সম্ভানদের প্রতি দায়িত্বশীল। আমাদেরকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে আমরা তাদেরকে কী শিখিয়েছি, আর কী শেখাইনি। এই দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখতে অবশ্যই আমাদের নিজেদেরকে এবং সম্ভানদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর শক্তি এই উম্মাহর ইলমের সাথেই সম্পর্কিত।

আরবি ভাষা শেখা

আরবি ভাষা মহাগ্রন্থ কুরআনের ভাষা, হাদীসের ভাষা এবং ইসলামের ভাষা। আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে একজন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ইলমের গভীরতা অর্জন করতে পারে না এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে বুঝতেও পারে না। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

‘আরবি ভাষা (শেখা) দ্বীনের অংশ। আর দ্বীনের ইলম অর্জন করা বাধ্যতামূলক। নিঃসন্দেহে কুরআন এবং সুন্নাহকে বোঝা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আরবি ভাষা না জানলে এই দুটি বিষয় বোঝা সম্ভব নয়। কোনো ফরয আমল পালনের জন্য যে-সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক সেগুলো পালন করাও ফরয।

ঈমান ও আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ বোঝার জন্য প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। কুরআন শুদ্ধভাবে পাঠ করার জন্য এবং অন্যান্য ইবাদাতের জন্য আরবি জানতে হয়।’^[৪২]

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾

‘আমি একে আরবি ভাষায় কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা একে ভালোভাবে বুঝতে পারো।’ (সূরা ইউসুফ, ১২ : ২)

كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

‘এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—যা আরবি ভাষার কুরআন। তা সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী।’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩)

[৪২] Ibn Taymiah, The Necessity of the Straight Path, vol. 1, p. 470.

وَالَّذِي يُزِيلُ رُتْبَ الْغَالِمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

‘এই কুরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেবেশতা (জিবরীল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে—আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন, (তা অবতীর্ণ হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।’ (সূরা শুআরা, ২৬ : ১৯২-১৯৫)

দুঃখের বিষয় হলো বর্তমান সময়ের মুসলিমরা এই সকল বার্তার গুরুত্ব এবং আরবি ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন। অনেক সময় দেখা যায় মুসলিমরা তাদের সন্তানদের বিদেশি ভাষা শেখাতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে, অথচ যে ভাষাতে আল্লাহ ওহি নাযিল করেছেন সেই ভাষার প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নেই। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে তারা বিভিন্ন ভাষার গুরুত্ব উপস্থাপন করেন এবং আরবি ভাষার গুরুত্ব অবহেলা করেন। অনেকে মনে করেন বর্তমান যুগে আরবি ভাষা অচল এবং গুরুত্বহীন। দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদেশি ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং সে-সকল ভাষাতে রচিত বইপুস্তক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। ফলাফল হিসেবে তরুণ প্রজন্ম আরবি ভাষা থেকে বিমুখ হয়ে অন্যান্য ‘দুনিয়াবি’ জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ ও শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো অনেক সময় বিভিন্ন আরব ভূমিতেও এমন মুসলিমদের দেখা মেলে যারা সঠিকভাবে আরবি বলতে, পড়তে কিংবা লিখতে পারে না!

আরবি ভাষা শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক—এই তথ্য মুসলিম পিতা-মাতার অন্তরে গেঁথে নেওয়া উচিত—যদি ইতোমধ্যেই তারা এ বিষয়ে না জেনে থাকেন। শিশু প্রথম যে ভাষা শুনে সেটা আরবি (শিশুর জন্মের পর তার কানে আরবিতে আযান দেওয়া হয়) এবং এটাই তার জীবনভর ‘ফার্স্ট ল্যান্ডুয়েজ বা প্রধান ভাষা’ হওয়া উচিত। আরবি ভাষা শেখা, পড়া, বলা দৈনিক রুটিনের অংশ হতে হবে। কেননা, কুরআন বোঝার জন্য, রাসুলের হাদীস বোঝার জন্য, এমনকি দীন বোঝার জন্য আরবি জানাটা জরুরি। (এখানে লেখিকা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলছেন) একজন প্রাক্তন অমুসলিম হিসেবে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একসময় আমি আরবি ভাষার একটি অক্ষরও জানতাম না! সেই অবস্থা থেকে আমি এখন বাধাহীনভাবে কুরআন পাঠ করতে পারি এবং অর্থ বুঝতে পারি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এখন আমি আরবি ভাষার গুরুত্ব এবং গভীরতা মূল্যায়ন করতে পারি!

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, শৈশবে ভাষা শেখা জীবনের অন্য সময়ের থেকে অনেক সহজ। গবেষণায় উঠে এসেছে, শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ

বছর পর্যন্ত সময়টুকু ভাষা শেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মগতভাবে শিশু এমন সক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যে, সে পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার যে-কোনো শব্দ ও আওয়াজ নকল করার ক্ষমতা রাখে। ধীরে ধীরে একই ভাষার শব্দ শুনতে শুনতে সে অন্যান্য ভাষার শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে। এ কারণে পিতা-মাতার উচিত শিশুর জন্মের পর থেকেই আরবি ভাষার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দ যেন সে শুনতে পারে এবং আরবি ভাষাতে টুকটাক কথাবার্তা বলতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর যারা আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করেছেন তারা স্বীকার করেছেন আরবি ভাষা শেখা অনেক জটিল, অথচ শৈশবে শিশুদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবি ভাষা শেখা খুবই সহজ।

কুরআন শেখা, মাখরাজ, তাজবীদ এই বিষয়গুলো শিশুদের জন্য খুব সহজ। কাজেই পিতা-মাতার করণীয় হলো শৈশবের সেই মূল্যবান সময়টুকু হারিয়ে যাওয়ার আগেই কাজে লাগানো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদান

জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবিজি (ﷺ) আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। কীভাবে জ্ঞান অর্জন করব এবং অপরকে শিক্ষা প্রদান করব সেক্ষেত্রেও তিনি সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক। তিনি তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শেখাতে প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন। বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় উপায়ে তিনি তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করতেন যা আমরা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। সে-সকল বিষয়ের কিছু আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যেন এর মাধ্যমে বাবা-মা নিজেদের শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি উন্নত ও বিকশিত করতে পারেন।

শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ খুবই জটিল একটি পদ্ধতি। এর সাথে ইসলামি নিয়মকানুন ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জড়িত থাকে। শুরুতেই সন্তানকে কিছু শেখানোর আগে পিতা-মাতার উচিত হবে সন্তানের সাথে একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি করা। এরপর বিভিন্ন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে শিশুর মনে যে-কোনো চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে দৃঢ়তা প্রদান করা। এ কারণে আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য আনতেন। যেমন- কখনও তিনি দৃশ্যমান উপমা পেশ করতেন, সত্য ঘটনা শোনাতে, কসম করতেন, উদাহরণ পেশ করতেন এবং বক্তৃতা দিতেন। স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে এ-সকল পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, পরিস্থিতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে নির্বাচন করতে হবে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে উপযুক্ত।

দৃশ্যমান উপমা প্রদান করা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায়শই বিভিন্ন দুর্বোধ্য তত্ত্ব বোঝানোর জন্য উপমা, দৃশ্যমান উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করতেন যেন লোকেরা সহজেই সেগুলো বুঝতে পারে। সচিত্র উপমার মাধ্যমে এমন সব সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা করা হতো যার মাধ্যমে একটি নৈতিক আচরণ বা ধর্মীয় মূলনীতি তাদের মানসপটে সঠিকভাবে ফুটে ওঠে। মানব ইতিহাসে যুগে যুগে নবি-রাসূল এবং জ্ঞানী মানুষরা এভাবে নানা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। আবু বাকর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তা হলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকি থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।’^[৪৩]

ঘটনা বর্ণনা করা

বিভিন্ন কাহিনি ও সত্য ঘটনা বর্ণনা করা একটি আকর্ষণীয়, উপভোগ্য এবং কার্যকরী প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি। এর মাধ্যমে শিশুরা ঈমান, মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করে। এই পদ্ধতিটি শিশুদের জন্য অধিক কার্যকরী কারণ শিশুরা দীর্ঘ সময় একই বিষয়ের উপর মনোযোগ রাখতে পারে না। তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রয়োজন হয়। নবিজি (ﷺ) তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে একবার তিনি সাহাবিদের বললেন, ‘বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে তখন তিনি ওই ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশি হন, যে তার পাথের ও (পানির) মশক একটি উটের ওপর তুলে দিয়ে (সফরের উদ্দেশ্যে) চলতে থাকে এবং এক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়। তখন তার দুপুরের বিশ্রামের সময় হয়ে যায়। সে নেমে গাছের নিচে দিবা-নিদ্রায় চলে যায়। সে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার উটটি চলে যায়। লোকটি জাগ্রত হয়ে (উটের খুঁজে) ওই টিলায় দৌড়ল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এরপর সে (অন্য টিলায়) দৌড়ল, কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পেল না। তারপর সে তৃতীয় আরেকটি টিলায় দৌড়ল, কিন্তু ওখানেও কিছু দেখতে পেল না। অবশেষে সে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল, সেখান এসে বসে রইল। এমন সময় হাটতে হাটতে উটটি হটাৎ তার নিকট ফিরে এল। অমনি সে তার লাগাম চেপে ধরল। আল্লাহ তার মুমিন বান্দার তাওবার কারণে যথাবস্থায় (ওই লোকটি) উট ফিরে পাওয়ায় সময়ের (আনন্দের) চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।’^[৪৪]

[৪৩] মুসলিম : ৬৬৭।

[৪৪] মুসলিম : ২৭৪৫।

কসম করা

আরবের প্রচলিত কালচার অনুসারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায়ই বিভিন্ন ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কসম করতেন। এটিও একটি মূল্যবান কৌশল, বিশেষ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হাইলাইট করার জন্য। আবু শুরাইহ বর্ণনা করেছেন যে নবিজি (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কে ‘সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তি?’ তিনি বলেন, ‘যার ক্ষতি (অনিষ্ট) থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’^[৪৫]

ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ধীরে ধীরে শেখানো

মানুষের জীবনের বিভিন্ন জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে নবিজি অবগত ছিলেন। ফলে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা-প্রদানে তিনি ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার বেলায় তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যেমন : মদ হারাম করার ক্ষেত্রে। কিন্তু এ পদ্ধতি বিভিন্ন আদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা হলো বিভিন্ন আদেশ মেনে নিতে মানুষের অন্তরে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে কিছুটা সময় লাগে। ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর প্রস্তুত হয়। হুট করে সব বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার বদলে বারবার এই বিষয়ে সতর্ক করে মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। ধারাবাহিক শিক্ষার মাধ্যমে এভাবে মানুষের অন্তর দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুরা স্বেচ্ছায় ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়, তাদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। এর বাস্তব উদাহরণ হলো হিজাব পরিধান করা, সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে তা শেখানো, রমাদানের সিয়াম পালন করা এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ।

বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা

মানুষের ভুল সংশোধন করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছেন যেন সেগুলোর মাধ্যমে তাদের ভুল আচরণ সংশোধন হতে পারে। তাই কেউ ভুল করলে তাকে অন্যের সামনে লজ্জা দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। সত্য প্রকাশের পর সে যেন বিনা বাধায় সেটা গ্রহণ করতে পারে, সেই পথ সুগম রাখতেন। যেমন, একটি হাদীসে এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিবলার দিকে (দেওয়ালে) থুথু দেখলেন। এটা তাঁর কাছে পীড়াদায়ক মনে হলো, এমনকি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। তিনি উঠে একটি লাঠির সাহায্যে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, ‘তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তাঁর রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তাঁর ও

[৪৫] বুখারি : ৬০১৬।

কিবলার মাঝখানে তার বব আছেন। কাজেই, তেমাের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তাঁর বাম দিকে বা পায়ের নিচে তা ফেলে। এবং বললেন, যদি একান্ত ফেলতেই হয়, সে যেন কাপড়ে ফেলে। তারপর তিনি তাঁর কাপড় মুখের সাথে ধরলেন এবং ঘষা দিলেন।^[৪৬]

মানুষের সহজাত প্রকৃতির দিকে মনোযোগ প্রদান করা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি, আবেগ-অনুভূতিগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতেন। এ কারণে তিনি মানুষের তুলত্রটি ও অনুপযুক্ত আচরণের প্রতি ধৈর্যশীল থাকতেন। এ পদ্ধতিটি নিশ্চিতভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কারণ তারা প্রায়শই তাদের সহজাত শিশুসুলভ আচরণ করে থাকে। এই হাদীসটি দেখুন : ‘একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তখন অপর একজন উম্মুল মুমিনীন তাঁর এক খাদিমের হাতে একটি পাত্রে কিছু খাদ্যবস্তু প্রেরণ করেন। তখন যে উম্মুল মুমিনীনের ঘরে নবিজি অবস্থান করছিলেন, তিনি পাত্রটি আঘাত করে ভেঙে দেন। তখন নবিজি ভাঙা পেয়ালার দুটি অংশ উঠিয়ে নেন, এর একটি অংশ অপরটির সাথে মেলাতে থাকেন, তার মধ্যে পড়ে-যাওয়া খাদ্য-বস্তু জমা করতে থাকেন এবং বলেন, তেমাের মা রাগান্বিত হয়েছেন। এরপর তিনি খাদেমকে থাকতে বললেন, তারপর যিনি পাত্র ভেঙেছেন তাঁর কাছ থেকে ভালো পাত্র আনালেন। এবং যার পাত্র ভাঙা হয়েছিল তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এবং ভাঙা পেয়ালটি যিনি পাত্র ভেঙেছেন, তাঁর ঘরে রেখে দেন।^[৪৭]

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষা-প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এই বইয়ের ছোট পরিসরে অসম্ভব। পিতা-মাতার জন্য উদাহরণ প্রদানের স্বার্থে আমরা অল্প কিছু উল্লেখ করলাম।^[৪৮]

[৪৬] বুখারি : ৪০৬।

[৪৭] বুখারি : ৫২২৫।

[৪৮] এই বিষয়ে একটি চমৎকার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বইটির নাম, ‘The Prophets Method of Correcting People's Mistake’ by Salih Al-Munajjid, Riyadh : IIPH 2004.

ফিতরাত : শিশুদের সহজাত প্রকৃতি

কখনও ভেবে দেখেছেন, কেন শিশুরা সহজাতভাবেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে? কেন আল্লাহর কালাম কুরআনকে বিশ্বাস করে? ‘না দেখে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করব না!’—শিশুদেরকে কখনও এমনটা বলতে দেখা যায় না। কখনও কি ভেবে দেখেছেন কেন শিশুরা এত সহজে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, হিজাব রক্ষা করে? অত্যন্ত আনন্দের সাথে তারা সেগুলো পালন করে। এমনকি দুই বছরের শিশুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় সে স্বেচ্ছায় নিজের মতো সালাত আদায়ের চেষ্টা করছে, অথচ কেউ তাকে কিছু শেখায়নি!

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুবই সহজ এবং স্পষ্ট—আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি উপহার ও বিশেষ যোগ্যতা প্রদান করেছেন। যদি ইসলামের মাধ্যমে সেই উপহারের খবর আল্লাহ না জানাতেন তা হলে আমরা জানতেও পারতাম না! সেই বিশেষ উপহার হলো ফিতরাত—মানুষের স্বভাব ধর্ম। এর মাধ্যমে সহজাতভাবে মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে, আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। ফিতরাতের সাথে বাড়তি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে সৃষ্টি জগতের নানা নিদর্শন, মানুষের যুক্তি বুদ্ধি এবং ওহির দিক-নির্দেশনা। এসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। ফিতরাতের উপহারটি পিতা-মাতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামাত। যখন পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহর পরিচয় এবং ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে তখন ফিতরাতের ভিত্তির উপরে বাকি সবকিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করে ফিতরাতের উপর। এই বীজ প্রত্যেক শিশুর অন্তরে বপন করা আছে। এর পরিচর্যা ও যত্ন নিলে সেটি সুন্দর ফলবান বৃক্ষ হতে পারে। পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো প্রয়োজনীয় আলো এবং পানির ব্যবস্থা করা। ফিতরাতের বিষয়টি অনুধাবনের মাধ্যমে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব অনেক সহজ ও আশাব্যঞ্জক হয়ে যায়।

ফিতরাত কী?

ফিতরাত হলো মানুষের সহজাত, স্বভাবজাত, অবিকৃত প্রকৃতি যার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে এবং তার মনোনীত দ্বীনকে মেনে নেয়। এটি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যায়ন করা ও সহজভাবে মেনে নেওয়ার মানবিক জন্মগত বৈশিষ্ট্য। এই জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে একজন সুমহান সত্তা রয়েছেন যিনি আমাদেরকে এবং আমাদের আশেপাশের সবকিছু, সমস্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরাত হলো আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক যোগ্যতা যা তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে খোদাই করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা করে আল্লাহ বলেছেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

‘কাজেই (হে নবি এবং নবির অনুসারীবৃন্দ) একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এ দ্বীনের দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও। আল্লাহ মানুষকে যে ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি-কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না। এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দ্বীনা কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।’ (সূরা রুম, ৩০ : ৩০)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ একটি পরিশুদ্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে যার কেন্দ্র তাওহীদ। এরপর ফিতরাত মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণে পরিচালিত করে, তার ভেতরে আল্লাহর নৈকট্য লাভের তাড়না সৃষ্টি করে। এ কারণে ইসলামকে বলা হয় ‘আদ-দ্বীনউল ফিতরাত’ (মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম), কারণ এটি এমন এক দ্বীন যা ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ঈমানের পথে পরিচালিত করে এবং তার সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। যুগে যুগে নবি রাসূলগণ মানুষের এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দিতে প্রেরিত হয়েছেন, তাদেরকে ইসলামি শারীআ শিক্ষা প্রদান করেছেন। এভাবে মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পূর্ণ দিক-নির্দেশনা লাভ করে। নবি-রাসূলগণ নিজেরাও ফিতরাতের নিয়ামাত লাভে ধন্য হয়ে আল্লাহর দিক-নির্দেশনা মেনেছেন এবং দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ থেকে বাকি মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করেছেন।

তাওহীদের চুক্তি স্বাক্ষরিত আছে প্রতিটি মানব-প্রাণে

যখন আল্লাহ সমস্ত মানুষদের রূহগুলো সৃষ্টি করেছেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন,

هَٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٦﴾ مَّنْ حَثَّى الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٧﴾

‘(তখন বলা হবে) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল— যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং সংরক্ষণকারী, প্রত্যেকের জন্যই। যে না দেখেও দয়াময়কে ভয় করে, এবং বিনীত অন্তর নিয়ে (তার সামনে) উপস্থিত হয়।’ (সূরা কাফ, ৫০ : ৩২-৩৩)

অন্যত্র তিনি এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
 شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٦﴾

‘আর যখন তোমার পালনকর্তা বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামাতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।’ (সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৭২)

এভাবে যে-সকল উপায়ে আমরা আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারি তার অন্যতম হলো আমাদের নিজেদের অন্তরে-খোদাই-করা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ আমাদের মানব সত্তার মধ্যে খোদাই করা আছে। এটিই আল্লাহর সাথে আমাদের চুক্তি। প্রত্যেক মানব-শিশু আল্লাহর উপর ঈমান এবং ইবাদাতের সহজাত বৈশিষ্ট্য-সহকারে জন্মগ্রহণ করে। সে নেককার এবং উত্তম আমলকারী হতে চায় এবং সে এই মহাবিশ্বে নিজের অবস্থান ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করে, আর সে এটা বুঝতে চায়।

যে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে সহজাতভাবেই মুসলিম হয়ে যায় কেননা প্রত্যেক শিশু মুসলিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। যদি জন্মের পর শিশুর স্বভাব ধর্মে কোনো পরিবর্তন না ঘটানো হয় তা হলে সে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

এই শিশু ভালো-মন্দ বোঝার মতো ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বয়সে উপনীত হলে অন্যান্য সকল বাতিল ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে নির্বাচন করবে। এটাই হলো আল্লাহর সাথে প্রত্যেক বান্দার জন্মগত সংযোগ। ফিতরাহের মাধ্যমে মানব-শিশু ভালো-মন্দ বোঝার দিকে পরিচালিত হয় এবং জীবনভর সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে থাকে।

শিশুমনে পিতা-মাতার প্রভাব

আপনি নিজের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন; তা হলে এত মানুষেরা কীভাবে তাদের জন্মগত

বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল? কীভাবে বিশ্বজুড়ে এত মানুষ ইসলাম বাদে অন্যান্য ধর্মগুলো নিজেদের জন্য মেনে নিল? বিশ্বব্যাপী এত দুর্নীতি ফিতনা-ফাসাদ ও যুলুমের বিস্তার কেন?

এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসে। তিনি বলেছেন, ‘প্রতিটি মানব-শিশু ফিতরাতের উপর জন্মায়। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহুদি বানায়, অথবা খৃষ্টান বা মাজুসী বানায়। (এর দৃষ্টান্ত হলো) যখন একটি উট জন্ম নেয় তখন কি তোমরা তার কান কাটা দেখতে পাও?’^[৪৯]

শিশুমনে পরিবেশের প্রভাব কত ব্যাপক তা এই হাদীসে সহজভাবে দৃষ্টান্ত পেশ করে বোঝানো হয়েছে। শিশু জন্মের পর তার পরিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দিকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ফিতরাত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে থাকে। এর জন্য সেই ব্যক্তির সহজাত ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যগুলো কিছুতেই দায়ী নয়। কেননা, ফিতরাত হলো বিশুদ্ধ, অবিকৃত বৈশিষ্ট্য। যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে বাস্তবে তারা নিজেদের ফিতরাতের বিরুদ্ধাচরণ করে। যদি কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি না করা হতো তা হলে প্রত্যেক মানুষই স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহ, তাওহীদ এবং ইসলামের উপর ঈমান আনত।

হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, পিতা-মাতা একজন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় প্রভাবক। এমনকি তাদের প্রভাবে সে তার ফিতরাত থেকে বিচ্যুত হতে পারে। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী বানিয়ে দেয়; ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নি-উপাসক অথবা অন্য যে-কোনো ধর্মের অনুসারী বানায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের পিতা-মাতা থেকে যা-কিছু শিখেছে সেগুলো নিজেদের সন্তানদের শিখিয়ে ওই ধর্মের অনুসারী বানিয়ে নেয়।

পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে নিজস্ব বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আদর্শ শেয়ার করে। এভাবে দেখে দেখে শেখা, পারস্পরিক মেলামেশা, লেনদেন, শিক্ষা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়গুলো সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যখন উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তারা তাদের পিতা-মাতার শিক্ষা, নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ-সহকারে বড় হয়। পিতা-মাতার মাধ্যমে শিশু প্রতিনিয়ত মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। পিতা-মাতার প্রভাব ছাড়াও আরও অনেক প্রভাবকের মাধ্যমে শিশু ফিতরাত থেকে বিচ্যুত হতে পারে। যেমন : পরিবেশের মাধ্যমে, স্কুল, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, বড় পরিবারের অন্যান্য সদস্যের আচরণ এবং বর্তমান যুগে মিডিয়ার মাধ্যমে একটি শিশুর চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

শিশুমনে শয়তানের প্রভাব

মানুষের ফিতরাত নষ্ট করতে শয়তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনে শয়তান, তার সহযোগী ও অনুসারীদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। শয়তান সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদের প্রভাবিত করে। এমনকি মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমাদেরকে কুরআনে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِّي لِأَفُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَيِّبُهُمْ مِّنْ نِّبْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

‘সে বলল, তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করছ তেমনি আমি ও এখন তোমার সরল-সত্য পথে এ লোকদের জন্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।’ (সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৬-১৭)

আল্লাহ যেসব উপায় বাতলে দিয়েছেন সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মুমিনরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে।

শিশুর ফিতরাত (সহজাত প্রকৃতি) রক্ষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব

সন্তানের ঈমান বিকাশে পিতা-মাতার দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে হলে ফিতরাতের ব্যাপারে ইলম থাকা জরুরি। সকল ধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত রেখে ফিতরাত অনুসারে শিশুকে বড় করা, পরিচর্যা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। জন্মের পর শিশুকে আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করার মাধ্যমে এটা অর্জন সম্ভব। নবজাতক প্রথম যে কথা শুনবে সেটা হবে ‘আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!’ ‘আল্লাহ সবচেয়ে বড়!’ তাই শিশু জন্মের পরেই তার কানে আযান দিতে হবে। এভাবে শিশুর জীবনকে করতে হবে আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ। শিশু যেন প্রতিনিয়ত তার পিতা-মাতাকে সালাত আদায় করতে দেখে, কুরআন তেলাওয়াত করতে শোনে এবং দৈনন্দিন কথাবার্তায় বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি শব্দগুলো বলতে শোনে। শিশুকে ইসলামের উপর বড় করার লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে সকল ধরনের অবাধ্যতা ও গুনাহের কাজ পরিহার করতে হবে। যদি এরকম একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তা হলে শিশু ঈমান ও তাকওয়া-সহকারে বেড়ে উঠবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুজাহাদা (সংগ্রাম) করবে। এভাবেই শিশুর আচার-আচরণ ও চিন্তায় খুব সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের বিকাশ ঘটবে।

বীজ বপন করার পর যেভাবে সূর্যের আলো ও বৃষ্টির প্রয়োজন হয় তেমনিভাবে শিশুর ফিতরাতের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পিতা-মাতাকেই প্রদান করতে

হবে। এভাবে ধীরে ধীরে শিশুর অন্তরে বপনকৃত ফিতরাতের বীজ অঙ্কুরোদগম ঘটে একটি মহীকুহে পরিণত হবে। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো দরদী মালির ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে পরিচর্যা করতে থাকা! আল্লাহর দ্বীনের দিকে শিশুর চেহারাকে অভিমুখী রাখা পিতা-মাতার অবশ্য-পালনীয়-দায়িত্ব। পরিবেশের প্রভাবে যেন সেই কচি চারাগাছটি নষ্ট না হয়ে যায়! আল্লাহ আমাদেরকে নির্দিষ্ট প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করেছেন। অঙ্কুরিত বীজের মতো স্বাভাবিকভাবেই আপনার সন্তানের ঈমান বেড়ে উঠবে। ফিতরাতের ভিত্তির উপর ঈমানের কাঠামো নির্মাণ করা যে এক চমৎকার স্বাচ্ছন্দ্য অভিজ্ঞতা!

দ্বিতীয় পর্ব

ঈমানের খুঁটিসমূহের সাথে শিশুকে সংযুক্ত করা

ঈমানের রুকনসমূহের সাথে শিশুর সম্পর্ক স্থাপনের কাজ জন্ম থেকে শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চলমান থাকে। এর জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রোগ্রাম বা কোর্সের প্রয়োজন হয় না। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা, পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ঈমানের রুকনসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। বস্তুত এটাই হলো সন্তান প্রতিপালনের কেন্দ্রীয় বিষয়। কীভাবে শিশুকে ঈমানের রুকনসমূহের সাথে জুড়ে দেওয়া যায়; কীভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী-রাসূলগণ, কিতাবসমূহ, বিচার-দিবস তথা আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি শিশুকে সংযুক্ত করা যায় এই মর্মে আলোচ্য অধ্যায়ে কিছু ব্যবহারিক ধারণা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ—যিনি উচ্চ, যিনি শক্তিমান

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

‘তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত সার্বভৌম সত্তা নেই। আল্লাহ-ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনিই মহা অধিপতি, অতীব পবিত্র, পূর্ণাঙ্গ শাস্তিদাতা, নিরাপত্তাদানকারী, হিফায়তকারী, সবার উপর বিজয়ী, মহা প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত। আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে। তিনিই আল্লাহ, যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা, মহা উদ্ভাবক, এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী। উত্তম নামসমূহ তাঁরই আসমান ও জমিনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করে চলেছে। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।’ (সূরা হাশর, ৫৯ : ২২-২৪)

আল্লাহর উপর ঈমান

ঈমান ও আমলের সবচেয়ে মৌলিক বিষয় আল্লাহর উপরে বিশ্বাস। এটা ঈমানের সবচেয়ে জরুরি উপাদান। এটা ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং কুরআন এর সারনির্যাস। এই বিশ্বাসের চতুর্পাশে ইসলামি আকীদার সকল বিষয় আবর্তিত হয়। সবকিছুই আল্লাহর উপরে ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি কেউ ঈমানে দৃঢ়তা অর্জন করতে চায় তবে আল্লাহর উপরে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বিশ্বাস থাকতে হবে, এরপর অন্যান্য সহযোগী মৌলিক বিষয়ের উপর ঈমান

থাকতে হবে। অন্যথায় ঈমানের দাবি ও ইবাদাত নিষ্ফল।

আল্লাহর উপর ঈমানের গুরুত্ব কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। বস্তুত সমস্ত কুরআন জুড়েই আল্লাহর উপর ঈমানের আলোচনা রয়েছে। আল্লাহর গুণবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ কুরআনে ১০,০৬২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। গড়ে কুরআনের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২০ বার আল্লাহর নাম উল্লেখ করা আছে। কুরআনে সরাসরি আল্লাহর নাম, সত্তাগত বৈশিষ্ট্য এবং কাজের আলোচনা আছে। শিরক বর্জন করে এককভাবে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য মানুষদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, তার আনুগত্যের আদেশ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। আরও উল্লেখিত হয়েছে ঈমানদার ব্যক্তিদের বিভিন্ন ঘটনা ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। দুনিয়াতে তাদের সম্মান এবং আখিরাতে সংরক্ষিত পুরস্কারের কথাও উল্লেখিত আছে। এভাবে কাফিরদের কঠিন পরিণতি, দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতে অপেক্ষমান শাস্তির আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।

ঈমানের কেন্দ্র হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা। ইসলামের ভিত্তি হলো তাওহীদ অনুধাবন করা এবং আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা। আর ইসলামের মৌলিক বিষয় হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য প্রদান করা। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাওহীদের বার্তা দিয়ে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। নবি-রাসূলগণ সর্বপ্রথম মানুষদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করতেন সেটা তাওহীদ।

তাওহীদের সারসংক্ষেপ এভাবে উল্লেখ করা যায় : আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও কাজে কোনো শরীক নেই, একমাত্র তিনিই রব (তাওহীদ আর-রুবুবিয়াত); তাঁর ইবাদাতে কোনো সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই (তাওহীদ আল-উলুহিয়াত); গুণ ও সত্তাগত বৈশিষ্ট্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই (তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত)। আল্লাহ আমাদের রব, প্রভু, মনিব এবং সবকিছুর তিনিই মালিক। জগতের সবকিছু তিনি পরিচালনা করেন। তিনি রিযিকদাতা, তিনি যা ইচ্ছা প্রদান করেন, যা ইচ্ছা বিরত রাখেন, তিনি অনুমতি প্রদান করেন, তিনি নিষেধাঙ্গা জারি করেন, তিনি জীবন-মৃত্যু ঘটান। এভাবে সকল ইবাদাতের তিনিই একমাত্র যোগ্য সত্তা।

আল্লাহর উপর ঈমান মানুষের সৃষ্টিগত সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ কিংবা ইবাদাত করে না তারাও নিজেদের ফিতরাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

‘যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?’ (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৭)

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

‘যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তাঁরই উপর ভরসা করে।’ (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৮)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٧٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِهِ مَلَكُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٧٣﴾

‘তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো তা হলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বাস করে তারা কার? তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহর। বলো, তা হলে তোমরা সচেতন হচ্ছে না কেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো, কার কর্তৃত্ব চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর? আর কে তিনি, যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ বিষয়টি তো আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বলো, তা হলে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছে কোথায় থেকে?’ (সূরা মু’মিনুন, ২৩ : ৮৪-৮৯)

মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টে, বিপদ-আপদে পতিত হয় এবং সাহায্যপ্রার্থী হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর কাছে আবেদন করে। তিনি আমাদের রব, তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেছেন,

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

‘মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামাত দান করি, তখন সে বলে,

এসব তো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির জোরে লাভ করেছি। না, এটা বরং পরীক্ষা।
কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।' (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৯)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ
وَجَعَلَ لِّلَّهِ أَنْذَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

‘মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে তখন সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং তাঁকে ডাকে। কিন্তু যখন তার রব তাকে নিয়ামাত দান করেন তখন সে ইতঃপূর্বে যে বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকছিল তা ভুলে যায়, এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতে থাকে, যাতে তারা আল্লাহর পথ থেকে তাকে গোমরাহ করে।' (সূরা যুমার, ৩৯ : ৮)

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَتَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ①

‘আমি যখন মানুষকে নিয়ামাত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই কোনো অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন লম্বা চওড়া দুআ করতে শুরু করে।' (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫১)

মানুষ জন্মগত সহজাত বৈশিষ্ট্য ও নিজের বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমেই আল্লাহ ও তাওহীদের উপর ঈমান অর্জন করতে পারে, এর সাথে অতিবিক্ত প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ ওহি নাযিল করেছেন। বস্তুত আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহকে প্রয়োজন। আল্লাহর ইবাদাত ব্যতীত মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণের কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহর সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন

শিশুকে আল্লাহর সাথে জুড়ে-দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চলমান প্রক্রিয়া। এর শুরু শিশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকে। দুনিয়াতে আগমন করে সর্বপ্রথম শিশু শুনতে পায় ‘আল্লাহ আকবার!’ শিশুর ডান কানে আযানের ধ্বনি প্রদান করা পিতার দায়িত্ব। যখন শিশু বড় হতে থাকে তখন যেন সে বাড়িতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। সালাত, দুআ এবং যিকির আযকার ও দৈনন্দিন কথাবার্তায় তাকে আল্লাহর নাম শোনাতে হবে। শিশুকে শেখাতে হবে যেন সে আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর অসম্বৃষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে। ভালোবাসা যেন ভয় থেকে বেশি হয়। শিশুর মধ্যে আল্লাহর অনুগত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে হবে।

শিশুদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি জুতসই পদ্ধতি হলো সৃষ্টিজগতে আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শনসমূহের পরিচয় প্রদান করা। আল্লাহ আমাদেরকে সৌন্দর্য ও নানা নিয়ামাত দান করেছেন। সৃষ্টিজগতের সর্বত্র তাঁর মনোমুগ্ধকর, নিখুঁত

কাজের নিদর্শন রয়েছে। মানুষ, পশুপাখি, নদনদী, বৃক্ষলতা, ফুল-পাখি ও আসমান-জমিনের সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। শিশুরা সহজাতভাবেই প্রকৃতিকে ভালোবাসে এবং আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে দেখতে ও জানতে চায়। আল্লাহর নাম, বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন গুণ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক স্থানে বেড়াতে-যাওয়া একটি নিয়মিত পারিবারিক ইভেন্ট হতে পারে। তখন আমরা শিশুদের প্রশ্ন করতে পারি; যেমন জানতে চাইতে পারি, ‘বলো তো! কে এই নদী সৃষ্টি করেছেন, কে এই ফুল আর পাখিপাখালি সৃষ্টি করেছেন?’ এভাবে আল্লাহর বড়ত্বের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষিত হবে। এর মাধ্যমে শিশুরা বুঝতে পারবে আল্লাহই হলেন একমাত্র জীবনদাতা, রিযিকদাতা, নিয়ামাত দানকারী ও অন্যান্য সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। প্রাসঙ্গিক সংযোজন হিসেবে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, এই নিয়ামাত পাওয়ার কারণে আল্লাহর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে যে-সমস্ত নিয়ামাত দিয়েছেন সে সম্পর্কেও আমরা শিশুদেরকে প্রশ্ন করতে পারি। অনেক সময় তারা আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামাতগুলো অনুধাবন করতে পারে না। যেমন : পিতা-মাতা, ভাই-বোন, টেবিলে রাখা মজার খাবার কিংবা প্রিয় পোশাক, তার সুস্থ শারীরিক আকৃতি, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সবই আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহ ও রহমত। এগুলো আল্লাহই দিয়েছেন। সুস্থ্য একটি দান অথচ আমরা এগুলো আমাদের প্রাপ্য বলে ধরে নিই এবং আল্লাহর অবদানের কথা ভুলে যাই! শিশুদের আমরা প্রশ্ন করতে পারি, ‘বলো তো! কে তোমাকে চোখ দিয়েছেন? কে কান দিয়েছেন, চিন্তা করার জন্য একটি মন দিয়েছেন? কে তোমাকে চলাফেরা করার শক্তি দিয়েছেন?’ শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে, যদি আল্লাহ তাঁর অসীম উদারতার মাধ্যমে এগুলো আমাদেরকে না দিতেন তা হলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না!

নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা, জ্ঞান অর্জন করা, প্রশ্ন করার ক্ষমতা, ইলম অর্জন, স্কুলের বইগুলো কিংবা যে স্কুলে আমরা প্রতিদিন যাই—এগুলো সবই আল্লাহর দেওয়া উপহার। বন্ধুত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করা, একে অপরের যত্ন নেওয়া, খোঁজ খবর নেওয়া ইত্যাদি আল্লাহর রহমতের অংশ। এ সকল উপাদানের মাধ্যমে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়। আমরা সুখে আনন্দে বেড়ে উঠি, আমাদের মানসিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা পূরণ হয়। কাজেই শিশুদেরকে আবারও উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা আল্লাহকে ভালোবাসতে পারে এবং তার শুকরিয়া আদায় করতে পারে। এ সকল চমৎকার এবং বৈচিত্র্যময় নিয়ামাত দিয়ে তিনি আমাদেরকে ধন্য করেছেন। যখন কোনো খুশির খবর আসবে, আনন্দের কিছু ঘটবে, বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটবে তখন আমরা নবিজির-দেখানো-উপায়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাব, সেটা হলো সাজদায় লুটিয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানানো। এই চমৎকার পদ্ধতিটি সহজেই শিশুকে আমরা শেখাতে পারি!

শৈশবের এই ছোট ‘বিস্টিং ব্লক’ দিয়েই শিশু একদিন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করতে শিখবে। কেননা, কেউ আমাদেরকে কিছু প্রদান করলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ হই ও ভালোবাসা অনুভব করি। শিশুদেরকে বলতে পারি, ‘কখনও কি ভেবেছ! যদি আল্লাহ আমাদেরকে এই নিয়ামাতগুলো না দিতেন তা হলে জীবন কত কঠিন হতো! কত কষ্ট হতো!’ এভাবে তারা আল্লাহর দানের মূল্য বুঝতে পারবে। আমরা নিজেরা পরিবারের মধ্যে কিছু খেলা খেলতে পারি। যেমন শিশুকে বলতে পারি, ‘মনে করো তোমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে! তুমি অন্ধ কিংবা কানে শুনতে পাচ্ছ না! এসো, এভাবে আমরা কিছুক্ষণ খেলা করি!’ অথবা ‘মনে করো তোমার সব বই হারিয়ে গেছে! তোমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা তুমি তোমার ভাইবোনের সাথে খেলাধুলা করতে পারছ না!’ এভাবে কিছুক্ষণ কাটালে শিশু এই নিয়ামাতগুলোর মূল্য বুঝতে পেরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা অনুভব করবে।

শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথেও আপনার সন্তানকে কিছুটা সময় কাটাতে নিয়ে যান। যারা দরিদ্র শিশু তাদেরকে দেখতে যান, অসুস্থ মুকুব্বীদের দেখতে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে শিশুকে নিয়ে যান অথবা তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে দেখে আসুন। এভাবে শিশু এই নিয়ামাতগুলো দশগুণ মূল্যায়ন করতে শিখবে!

আরেকটু বড় হলে শিশুকে কুরআনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিভিন্ন নিয়ামাত নিয়ে চিন্তা করতে বলুন। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ ۝۳۱
وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ ۝۳۲ وَأَتَاكُمْ مِنَ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۳

‘আল্লাহ তো তিনিই, যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তারা অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। যিনি এমন সবকিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ, যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামাতসমূহ গণনা করতে চাও তা হলে তাতে সক্ষম হবে না। আসলে মানুষ বড়ই বে-ইনসার ও অকৃতজ্ঞ।’ (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩২-৩৪)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

‘আল্লাহ তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বাসস্থান করেছেন, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ বরকতময়।’ (সূরা গাফির, ৪০ : ৬৪)

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

‘বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’ (সূরা মুলক, ৬৭ : ২৩)

একটু বড় শিশুদেরকে আমরা শেখাতে পারি, দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহ মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

‘তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেনা...’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৯)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

‘তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন...’ (সূরা লুকমান, ৩১ : ২০)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

‘তিনি জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, সবই নিজের পক্ষ থেকে। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।’ (সূরা জাসিয়াহ, ৪৫ : ১৩)

বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেও আমরা আল্লাহর অনেক নিয়ামাত তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। যেমন চাঁদ-সূর্যের আবর্তন, দিন-রাতের পরিবর্তন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে সংরক্ষিত নানা খনিজ সম্পদ; তেল-গ্যাস, ধাতু; পানি চক্র ইত্যাদি।

আল্লাহর যে-সকল উত্তম গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলো মুখস্ত করা এবং অর্থ জানার মাধ্যমেও শিশুর মনে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিতে পারি।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٦٤﴾

‘তিনি আল্লাহ—তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ’ (সূরা হু-হা, ২০ : ৮)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

‘আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকো।’
(সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৮০)

আল্লাহর নাম এবং গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষের প্রতি তাঁর দয়া, রহমত ইত্যাদি গুণসমূহ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার বড়ত্ব বুঝতে পারে। এই কাজে শিশুরা আনন্দ অনুভব করে। এটা আমরা ছোট বয়স থেকেই শুরু করতে পারি। বিভিন্ন গুণবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ, কাহিনি, ঘটনা এবং কুরআনের আয়াত উল্লেখ করলে এটা খুবই কার্যকর হয়।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি, সম্মান, শ্রদ্ধা, তাঁর নিয়ামাত সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন এই বিষয়গুলো অনুধাবন করার মাধ্যমে শিশুর মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হবে। সে বুঝতে পারবে, আল্লাহ শুধুমাত্র সেসব কাজের আদেশ প্রদান করেন যা আমাদের জন্য উত্তম এবং কল্যাণকর। সমস্ত সৃষ্টিজগতে সে এ কথার মিল খুঁজে পাবে। এটি ব্যাপকভাবে তার ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভক্তিকে মজবুত করবে। এভাবে আমরা সহজেই শিশুদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব প্রশিক্ষণ দিতে পারি।

শিশুকে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব শেখান

শিশুকে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক। ‘আনুগত্য’ শব্দটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্ব-সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।’ (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

‘হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তা হলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে

ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো।
এটিই সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।' (সূরা নিসা,
৪ : ৫৯)

যে মুসলিম আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন তিনি জানেন এই আত্মসমর্পণের অর্থ হলো আনুগত্য এবং আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সাঁপে দেওয়া। এটিই ইসলামের পথ এবং একমাত্র সত্যিকার শাস্তির পথ। শিশুদের অবশ্যই বোঝাতে হবে যে আল্লাহর আনুগত্য করতে হয় তাঁর প্রতি ভয়, ভালোবাসা ও আশা-সহকারে। আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ রাসূলের সূন্নাত অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য করা। অনেক সময় নিজের খেয়াল-খুশি, কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে গিয়ে আনুগত্য করতে হয় এবং রাসূলের সূন্নাতকে অনুসরণ করতে হয়। মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্য না করে তা হলে সে নিজের খেয়াল-খুশির গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সেই গোলামির শিকল ছিন্ন করা সম্ভব ও আত্মিক উন্নতি করা সম্ভব। শিশুদের জন্য এটি একটি মূল্যবান শিক্ষা। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে নফসের কুমন্ত্রণা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে একমাত্র আল্লাহই তাকে রক্ষা করতে পারেন। বিশেষত যখন সে বয়সন্ধিকালে পৌঁছাবে তখন এই শিক্ষার উপকারিতা অনুভব করতে পারবে। মানুষের জন্য এই সংগ্রাম কষ্টসাধ্য হলেও সকলের দ্বারা এর পূর্ণতা অর্জন সম্ভব।

বস্তুত এই সংগ্রামের মাধ্যমে দুনিয়াবি পরিতৃপ্তি পরিত্যাগ করা হয় আখিরাতের পরিতৃপ্তি অর্জনের জন্য। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই বিষয়টিকে বলা হয় 'delayed gratification'। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন ক্ষণস্থায়ী, তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তিকে দীর্ঘ মেয়াদি, বৃহৎ পুরস্কারের জন্য উৎসর্গ করে। ঠিক এই বিষয়টির ওয়াদা আল্লাহ মুমিন বান্দাদের প্রতি করেছেন—যারা আনুগত্য করে ও আত্মসমর্পণ করে। তিনি বলেছেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

‘এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১৩)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿١٤﴾

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সহযোগী হবে—
যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও সংকর্মশীলদের মধ্য
থেকে মানুষ যাদের সঙ্গ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই-না চমৎকার
সঙ্গী!’ (সূরা নিসা, ৪ : ৬৯)

এক্ষেত্রে আখিরাতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিশেষ উপকারী। এই
বিষয়ে সামনে একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আনুগত্যের ইচ্ছা ব্যতীত আনুগত্যের যোগ্যতা অর্জিত হয় না। পূর্বে উল্লেখ করা
হয়েছে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমেই আনুগত্যের যোগ্যতা অর্জিত হয়।
শিশু বড় হবার আগেই এই বিষয়ের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটাতে হয়, যেন সে আল্লাহকে
ভালোবাসতে পারে। নিঃসন্দেহে যে পিতা-মাতা আল্লাহর প্রতি অনুগত তারা নিজেদের
সন্তানের মধ্যে এই গুণটি সহজেই বিকশিত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যে পিতা-
মাতা নিয়মিত সঠিক সময়ে সালাত আদায় করেন, ফরয আমলসমূহ পালন করেন,
আন্তরিকভাবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা-সহ হারাম বিষয় থেকে বিরত থাকেন—
তারা তাদের সন্তানদের জন্য নিজেদেরকেই ‘রোল মডেল’ হিসেবে পেশ করেন। সন্তানের
সামনে পিতা-মাতার ‘রোল মডেল’ হলো প্যারেন্টিং-এর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবক।
এর গুরুত্ব কিছুতেই খাটো করে দেখা উচিত নয়। এর পাশাপাশি সরাসরি আদেশ-
নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য সংরক্ষিত পুরস্কার এবং অবাধ্যদের
জন্য সংরক্ষিত শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ঈমানদার বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার
আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

শিশুকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখান

তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার অর্থ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর আস্থা-স্থাপন
করা ও নির্ভর করা—বিশেষ করে জীবনের কঠিন সময়গুলোতে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস
রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
পিছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন : ‘হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা
শেখাব—আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে
স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে;
যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখো, সমস্ত মানুষ যদি
তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,
তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো
অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর

কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।^[৫০] অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে : ‘আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো—যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না। আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরও জেনে রাখো—ধৈর্যধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কঠিন অবস্থার পর সহজতা আসে।’^[৫১]

এই শক্তিশালী হাদীসটির মাধ্যমে একাধারে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যেন তারা তাদের সকল প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয় ও তাঁর কাছে চায়। মুসলিমদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং অবাধ্যতা পরিহার করতে। জীবনের বাধা বিপত্তি এবং বাস্তবতাগুলো আশাবাদী হয়ে মোকাবিলা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদের উচিত দুনিয়ার সকল চ্যালেঞ্জকে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করা। সকল কঠিন পরিস্থিতি ধৈর্যশীলতার সাথে অতিক্রম করা উচিত। যদি দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহর কাছে অধিক দুআ করা হয় তবে কষ্টের পরেই আসে স্বস্তি! এই হাদীসটি ঈমান, আকীদা এবং তাওহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

‘এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।’ (সূরা তালাক, ৬৫ : ৩)

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

‘অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৫৯)

[৫০] তিরমিযি : ২৫১৬।

[৫১] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ রচিত একটি চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে। বাংলায় অনূদিত গ্রন্থটির নাম ‘নবীজির পদাংক অনুসরণ’; সীরাত পাবলিকেশন।

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٥١﴾

‘এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।’ (সূরা মায়িদা, ৫ : ১১)

শিশুদেরকে ছোটবেলা থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো প্রদান করতে হবে। আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এগুলো অর্জিত হয় পরোক্ষভাবে। পিতা-মাতা এবং শিশুর আন্তরিক মুহূর্ত, বিশেষ সময় ও সুযোগ ব্যবহার করে এগুলো শেখাতে হয়। যেমন শিশু যখন আপনার কাছে কোনো কিছু চাইবে, কোনো সাহায্য চাইবে তখন তাদেরকে বলতে হবে, ‘তুমি প্রথমে আল্লাহর কাছে চাও, আল্লাহর কাছে দুআ করো!’ শিশু যদি কোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকে কিংবা কোনো কঠিন বাড়ির কাজ করতে ঘাবড়ে যায় অথবা কোনো একটি দৈনন্দিন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন পিতা-মাতা বলবেন, ‘তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আল্লাহকে স্মরণ করো!’ যদি তারা কিছু ভুলে যায়, কিছু হারিয়ে ফেলে এবং খুঁজে না পায় তখন সাথে-সাথেই তাদেরকে বলা উচিত, ‘তুমি আল্লাহর কাছে দুআ করো যেন তিনি হারানো-জিনিস খুঁজে পেতে তোমাকে সাহায্য করেন!’

শিশু অসুস্থ হলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, ‘যদি তুমি আল্লাহর কাছে দুআ করো তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেবেন!’ বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে যে-সকল সুনির্দিষ্ট আয়াত-হাদীস এবং দুআ রয়েছে সেগুলো শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কোনো পরিকল্পনা ঠিকভাবে কাজ না করলে শিশুকে আল্লাহর কাছে দুআ করতে উৎসাহিত করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য দুআ করতে গিয়ে শিশুরা বুঝতে পারবে, সব সময় তারা যেভাবে চায় সেভাবে দুআর জবাব প্রদান করা হয় না, বরং আল্লাহ যা আমাদের জন্য উত্তম মনে করেন তিনি সেভাবেই দুআ কবুল করে থাকেন। আল্লাহর উপর নির্ভরতা, ভরসা ও আস্থার আরেকটি দিক হলো মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস করা যে—আল্লাহ রহমান, তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি তাঁর বান্দার কোনো ক্ষতি করতে চান না। তিনি তাদের জন্য সবকিছুই কল্যাণকর হিসেবে নির্ধারণ করেন।

আল্লাহর উপর নির্ভরতার মাধ্যমে মুমিন বান্দার কষ্ট লাঘব হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ শান্তির নিশ্চয়তা অর্জিত হয়। বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তার প্রতি সাড়া দেন এবং নিজেও ওই বান্দার নিকটবর্তী হতে থাকেন। নিজের পক্ষ থেকে সাহায্য এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি যা ফরয করেছি আমার বান্দা তা ব্যতীত অন্য কোনো পছন্দসই জিনিসের দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দা নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি, তখন আমি

তার কান হয়ে যাই—যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই—যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই—যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই—যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে তা দিই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি।^[৫২]

তিনি আরও বলেছেন,

‘আল্লাহ বলেছেন, বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করে আমি তদ্রূপ আচরণকারী। যখন সে আমার যিকির করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মজলিসে আমার যিকির (স্মরণ) করে তা হলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তা হলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।’^[৫৩]

আল্লাহর উপর নির্ভরতা, ভালোবাসা এবং নৈকট্য অর্জন করা একটি লাইফলাইন (Lifeline; ডুবুরি যে দড়ির সাহায্যে জাহাজে-থাকা-ব্যক্তিদের প্রতি প্রয়োজনীয় জরুরি সংকেত জানায়) যা সে সারাজীবন আঁকড়ে থাকবে। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এই বিষয়টি অনুভব করার মাধ্যমে সে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করবে। আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পদে পদে মজবুত করতে থাকবে। সে সর্ববিস্তার আল্লাহর সাহায্য, উপস্থিতি ও জ্ঞানের ব্যাপকতা অনুভব করবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾

‘হে নবি! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা-কিছুই শুনাতে থাকো; আর হে লোকেরা! তোমরাও যা-কিছু করো, সেসবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোনো অণুপরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোনো জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টিতে অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।’ (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১)

এটিই হলো আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাকওয়ার সারনির্ঘাস।

[৫২] বুখারি : ৬৫০২।

[৫৩] বুখারি : ৭৪০৫।

ফেরেশতাদের কথা

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ بِالْحِجَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٥٧﴾

‘যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার উপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ে না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে, তাই পাবো আর যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা করবে, তাই লাভ করবে।’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০-৩১)

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

ঈমানের দ্বিতীয় রুকন হলো ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস। ফেরেশতারা গায়েব বা অদৃশ্য জগতের অংশ। ফলে তাদের উপস্থিতি এবং ধরন-বৈশিষ্ট্য আমরা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম নই। আমরা কেবল ততটুকুই জানি যতটুকু আল্লাহ আমাদেরকে ওহির মাধ্যমে জানিয়েছেন। কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকে আমরা সেগুলো সত্য বলে গ্রহণ করি। ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এখানে কোনো সংযোজন-বিশেষ করার অবকাশ নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা জানিয়েছেন সেগুলো সেভাবেই বিশ্বাস করতে হয়।

ফেরেশতারা মানুষের মতো নন। তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। ফলে তাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয় না, তারা কোনো ভুলত্রুটি করেন না, তাদের কোনো কামনা-

বাসনা নেই। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক হলো পরিপূর্ণ আনুগত্য, ইবাদাত এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের সম্পর্ক। ফেরেশতাদের এক অংশ সর্বদা রুকু, সাজদা, বা কিয়ামরত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করে যাচ্ছেন, আরেক অংশ আল্লাহর আদেশে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ইবাদাত এবং প্রশংসার পাশাপাশি কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকে তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করেন।

আল্লাহর নির্দেশে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন ঘটনা তারা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সেগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। সন্তান গর্ভধারণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ফেরেশতাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক চলতে থাকে। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তারা সম্পূর্ণ মানব জীবনের সাথে জড়িয়ে আছেন। বিশেষ করে মুমিন বান্দাদের জীবনে তারা নানাভাবে যুক্ত।

প্রত্যেক ফেরেশতাকে একটি সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা সমন্বিতভাবে কাজ সম্পন্ন করেন। কিছু ফেরেশতাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে মায়ের গর্ভে ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে। এরপর নির্ধারিত সময়ে সেই ঈশ্বরে তারা রুহ ফুকে দেন এবং মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। মানুষকে বিপদ আপদ হতে রক্ষা করার জন্য কিছু ফেরেশতাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জমিনের বুকে কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা মানুষকে সামনে, পিছনে, ডানে-বামে, চতুর্দিকের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, যা আল্লাহ তার তাকদীরে নির্ধারণ করেননি। কিরামান-কাতিবীন প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন। মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের কাজ চলতে থাকে। তাদের লিপিবদ্ধ আমলনামা বিচারের দিনে উন্মুক্ত করা হবে। মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তার সহযোগী ফেরেশতারা প্রত্যেক মানুষের জান কবজ করে থাকেন। কবরের প্রশ্নোত্তরের জন্য বিশেষ ফেরেশতা মোতায়েন করা আছে। তাদের নাম মুনকার-নাকির। বারযাখের জীবনে মানুষের আত্মাকে তারা প্রশ্ন করবেন এবং আখিরাতে প্রত্যেকের চূড়ান্ত গন্তব্য জানিয়ে দেবেন। আরও বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ সর্বদা মোতায়েন রেখেছেন।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান রাখা একজন মুসলিমের ঈমান-আকীদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের উপর বিশ্বাসের অর্থ হলো কুরআন-হাদীসে তাদের সম্পর্কে যা-কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সবকিছু পূর্ণাঙ্গভাবে স্বীকার করা। এই দুটি উৎস থেকে আমরা তাদের অল্প কিছু বৈশিষ্ট্য, নাম এবং দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। মানুষের জীবনের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে বুঝতে হবে।

একজন ঈমানদার বান্দা যখন নিজের জীবনে ফেরেশতাদের প্রভাব বুঝতে পারে তখন তাদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফেরেশতাদের উপরে ঈমানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সবার করতে শেখে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য করে। যখন একজন

ব্যক্তি অনুভব করে যে ফেরেশতারা সর্বদা তাকে দেখছেন এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজের বিবরণ আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন তখন একজন মুমিন সচেতন হয়ে ওঠে। নিজের কাজের প্রতি সাবধান হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে ভালো আমল করতে থাকে। সত্যিকারের মুমিন জানে আল্লাহর পথে সে কখনও একা নয়, ফেরেশতারা তাকে ঘিরে রেখেছেন এবং নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করে যাচ্ছেন। আরেকটি বিশেষ অনুভূতি হলো ফেরেশতাদের উপর ঈমানের মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার উপর কোনো বিপদ-আপদ আসবে না। আল্লাহ এই বিশ্বজগতের সবকিছুকে সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কার্যকর রেখেছেন। ফেরেশতারা সেই সিস্টেমের একটি অংশ। মানুষের জীবনের সাথে তাদের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারা মুমিনদের নানাভাবে উপকার করেন। তাদের অন্তরে প্রশান্তি বহন করে আনেন, তাদেরকে ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করেন, দ্বীনের পথে দৃঢ় ও মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পৌঁছে দেন।

ফেরেশতাদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন

ছোটবেলা থেকেই শিশুদেরকে ফেরেশতাদের বিষয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। ওহি ও নবি-রাসূলদের ব্যাপারে আলোচনা করার পূর্বে ফেরেশতাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে কারণ ফেরেশতারা হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী। ফেরেশতাদের ব্যাপারে না বুঝলে ওহি ও কুরআন নাযিলের বিষয়গুলো বোঝা শিশুদের জন্য কঠিন। জিবরীল আলাইহিস সালাম হলেন ওহি বহনকারী ফেরেশতা। তিনি সকল নবিদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বহন করে এনেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ধারাবাহিকভাবে তেইশ বছর নিয়মিত বিরতিতে ওহি নিয়ে এসেছেন। ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখা এবং জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর উপর ঈমান আনা, কুরআনের উপর ঈমান আনার পূর্বশর্ত।

আমরা শিশুদেরকে সেই সমস্ত ঘটনা পড়ে শোনাতে পারি যেখানে ফেরেশতারা নবিদের সাথে কথা বলেছেন কিংবা মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় বর্ণনাটি হলো যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম ওহি নিয়ে হেরা গুহাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। আল-ইসরা ওয়াল-মিরাজ আরেকটি চমৎকার ঘটনা যেখানে জিবরীল আলাইহিস সালাম নবিজিকে উর্ধ্ব আসমানে পৌঁছে দিতে সঙ্গ দিয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ফেরেশতাদের নানা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা রাসূলদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসতেন। যেমন : ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাছে, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং লূত আলাইহিস সালাম-এর ঘটনায় ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ আছে। এর বাইরেও অনেক ঘটনা রয়েছে।

ফেরেশতাদের বর্ণনার মাধ্যমে যেভাবে আল্লাহর শক্তি-সামর্থের দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে

সেগুলো শিশুদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হতে পারে। একটি হাদীসে সেই বর্ণনাটি এসেছে যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফেরেশতা জিবরীলকে নিজের আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। তিনি এত বিশালাকৃতির ছিলেন যে, তার ৬০০ পাখা দিয়ে সম্পূর্ণ দিগন্ত ঢেকে গিয়েছিল। ফেরেশতার অন্য আকৃতিতেও আসতে পারেন। যেমন, তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারেন। এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে শিশুরা আল্লাহর অসীম শক্তি সম্পর্কে জানতে পারবে ও আল্লাহর প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগবে। খেয়াল রাখতে হবে, ফেরেশতাদের সম্পর্কে কোনো ভুল বা বিকৃত ধারণা পোষণ করা যাবে না, বিশুদ্ধভাবে তাদের উপর ঈমান রাখতে হবে।

ফেরেশতাদের বিভিন্ন ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। ফেরেশতাদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য সেই ঘটনাগুলো শিশুদেরকে পড়ে শোনানো যেতে পারে। এগুলোতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা রয়েছে। এমন কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘একব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসকারী তার এক (দ্বীনি) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে রওনা হলো। আল্লাহ তাআলা তার চলার পথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিলেন। যখন সে রাস্তায় নেমে এল, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা-পোষণ করছেন?’ জবাবে লোকটি বলল, ‘অমুক গ্রামে আমার (দ্বীনি) ভাই থাকে, তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি।’ ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করেছেন যার প্রতিদান নিতে যাচ্ছেন?’ লোকটি বলল, ‘আল্লাহ তাআলার সম্বৃষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমি তাকে ভালোবাসি—এর পিছনে অন্য কোনো স্বার্থ নেই।’ ফেরেশতা তাকে বলল, ‘আমি আল্লাহর প্রেরিত দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি শুধু এ কথা জানানোর জন্য যে, আপনি যেভাবে ওই লোকটিকে (আল্লাহর জন্যে) ভালোবাসেন আল্লাহও সেভাবে আপনাকে ভালোবাসেন।’^[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘বানী ইসরাঈলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছিল। তারপর (তার মনে অনুশোচনা জাগ্রত হলে নাজাতের পথ অনুসন্ধানের আশায় বাড়ি থেকে) বের হয়ে একজন পাদরিকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তাওবাহ কবুল হওয়ার সুযোগ আছে কি? পাদরি বলল, না। তখন সে পাদরিকেও হত্যা করল। এরপর পুনরায় সে (লোকদের নিকট) জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন একব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও সে রওনা হলো এবং

পশ্চিমদিকে তার মৃত্যু হলো। সে তিনি তাঁর চেহারা (তাওবার) গম্ভীরা-অভিমুখী করে রাখলেন। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশতাগণ তার কাছকে নিয়ে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলেন। আল্লাহ সম্মুখের ভূমিকে (যেখানে সে তাওবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল) আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। তারপর ফেরেশতাদের উভয় দলকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ করো। পরিমাপ করা হলো। দেখা গেল মৃত লোকটি সম্মুখের দিকে এক বিঘত অধিক অগ্রসরমান। আল্লাহর রহমতে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো।'^{১০০}

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে তিনটি লোক ছিল। এক জন কুষ্ঠ রোগী, দ্বিতীয় জন টেকো এবং তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা করলেন এবং এ লক্ষ্যে একজন ফেরেশতাকে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি কুষ্ঠ রোগীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোনটি? সে বলল, 'সুন্দর গায়ের রঙ, সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি, যার দরুণ লোকেরা আমায় ঘৃণা করে।' ফেরেশতা তার শরীর মুছে দিলেন। এতে তার রোগটা সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর গায়ের রঙ দান করা হলো। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচাইতে প্রিয়? সে বলল, 'উট কিংবা গরু।' (এটা বর্ণনাকারী সন্দেহ)। তখন লোকটিকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেওয়া হলো। ফেরেশতা বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দিন।'

এরপর তিনি টেকো লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোনটি? সে বলল, 'সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি, যার দরুণ লোকেরা আমায় ঘৃণা করে।' ফেরেশতা তার মাথা মুছে দিলেন। এতে তার টাক সেরে গেল এবং তার মাথায় সুন্দর চুল গজাল। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়?' সে বলল 'গরু'। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দান করুন।

এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কী?' সে বলল, 'আমার চোখ। আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি।' ফেরেশতা তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে তার অন্ধত্ব ঘুচে গেল, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়?' লোকটি বলল, 'ছাগল'। তখন তাকে এমন একটি ছাগী দেওয়া হলো, যা বেশি বাচ্চা দান করে। এরপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা জন্মাল। এতে উট দ্বারা একটি মাঠ, গরু দ্বারা আরেকটি মাঠ এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি মাঠ একেবারে

পূর্ণ হয়ে গেল।

এরপর তিনি (ফেরেশতা) কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে বললেন, ‘দেখো, আমি একজন মিসকিন। সফরে আমার সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারি। যে আল্লাহ তোমায় এত সুন্দর গায়ের রঙ, সুন্দর ত্বক ও প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাঁর নামে আমি তোমার কাছে একটা উট সাহায্য চাইছি, যাতে করে আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি।’ সে বলল, (আমার ওপর তো) ‘অনেকের হক রয়েছে’। তিনি বললেন, ‘আমি সম্ভবত তোমাকে চিনি। তুমি না কুষ্ঠ রোগী ছিলে? তোমাকে না লোকেরা ঘৃণা করত? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? এখন আল্লাহ তোমায় সম্পদ দিয়েছেন।’ সে বলল, ‘আমি তো এ সম্পদ পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।’ তিনি বললেন, ‘তুমি যদি মিথ্যাচারী হয়ে থাকো, তা হলে আল্লাহ যেন তোমায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন।’

এরপর তিনি টেকো লোকটির কাছে এসে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, যা প্রথম লোকটিকে বলেছিলেন। টেকো লোকটিও সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা তাকেও বললেন, ‘তুমি যদি মিথ্যাচারী হয়ে থাকো, তা হলে আল্লাহ যেন তোমায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।’ এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন, ‘আমি একজন নিঃস্ব (মিসকিন) মুসাফির। আমার সবকিছু সফরে ফুরিয়ে গেছে। এখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য আমার আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই। তাই সে আল্লাহর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল সাহায্য চাইছি, যিনি তোমার চোখকে নিরাময় করে দিয়েছেন। লোকটি বলল, ‘আমি বাস্তবিকই অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন; সুতরাং তুমি তোমার ইচ্ছামতো মাল-সামান নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও।’ আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে যা-কিছু নেবে, তাতে আমি কোনো বাধা দেবো না।’ ফেরেশতা বললেন, তোমার ধন-মাল তোমার কাছেই থাকুক। তোমাদের শুধু পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অন্য দুজন সঙ্গীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।^[৫৬]

হাদীসের এই ঘটনাগুলো ফেরেশতাদের অস্তিত্বের বাস্তবতা বোঝাতে শিশুদেরকে সহায়তা করে। তাদের ঈমানকে মজবুত করে এবং তারা বুঝতে পারবে, দুনিয়াতে তাদেরকে পাঠানোর পেছনে আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। ফেরেশতারা আল্লাহর নিয়োজিত প্রতিনিধি এবং ফেরেশতা পাঠানোর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেন, তাদের কল্যাণকামী এবং বান্দার প্রয়োজন পূরণে তিনি সময়মতো হস্তক্ষেপ করেন। আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ফেরেশতারা সরাসরি সংযোগ রক্ষা করেন।

আল্লাহর আদেশে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন ঘটনা ফেরেশতারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা

করেন। জীব-জড়, মানুষ-জিন নির্বিশেষে সকলকেই তারা পর্যবেক্ষণ করেন। জগতের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় ও নিয়মনীতি ঠিক রাখেন। চন্দ্র-সূর্য পরিচালনার জন্য কিছু ফেরেশতা মোতায়ন রয়েছেন। আবার কাউকে মোতায়ন করা হয়েছে গ্রহ-উপগ্রহ, মেঘ-বৃষ্টি, পাহাড় পর্বতের দায়িত্ব দিয়ে। তাকদীরে নির্ধারিত আদেশ অনুসারে তারা এগুলোকে নিজ নিজ দায়িত্বমতো পরিচালিত করেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

‘এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করো’ (সূরা নাহিয়াত, ৭৯ : ৫)

আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফেরেশতা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। শিশুরা খুব সহজেই এই বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে নেয়। এর সূত্র ধরে আমরা তাদের সঙ্গে দুইটি আলোচনা শুরু করতে পারি। যখন বৃষ্টি হয় আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারি, ‘কীভাবে বৃষ্টি হচ্ছে?’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন।’ এরপর আমরা প্রশ্ন করতে পারি, ‘আল্লাহর আদেশ অনুসারে কে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরাচ্ছেন?’ তখন তারা জবাব দিবে, ‘ফেরেশতারা!’ তখন তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ফেরেশতাদের নাম ও কাজের বর্ণনা শোনাতে পারি। যেমন মিকাইল আলাইহিস সালাম মেঘ-বৃষ্টির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

এই ছোট ছোট স্মরণিকাগুলো একত্র হয়ে শিশুর মনে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের উপর ঈমানকে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় করবে। যদিও শিশুরা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পায় না তবুও তাদেরকে বোঝাতে হবে ফেরেশতারা আমাদের আশেপাশেই রয়েছেন।

শিশুদের শেখাতে হবে যে তাদের জীবনের অনেক ঘটনার সাথে ফেরেশতারা জড়িত। এটা শুরু হয়েছে যখন তারা মায়ের গর্ভে ছিল, তখন থেকে। জরায়ুতে থাকা ভ্রূণের যত্ন নেওয়ার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। তারাই সেই ভ্রূণে সময়মতো রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং অনাগত শিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নুতফা আকারে জমা রাখা হয়। অতঃপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে একই পরিমাণ সময় থাকে এবং পরে তা মাংসপিণ্ড আকারে অনুরূপ সময় পর্যন্ত জমা রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তাতে আত্মা ফুঁকে দেন এবং তাকে চারটি বিষয় লেখার জন্য আদেশ করা হয়—রিযিক, মৃত্যু, আমল ও তার ভাগ্য; সে কি সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্য।’^[৫৭]

যখন শিশুরা বালেগ হয় এবং তাদের কাঁধে বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব আসতে থাকে তখন

[৫৭] বুখারি : ৭৪৫৪; মুসলিম : ২৬৪৩

থেকেই ফেরেশতারা তাদের আমলনামায় ভালো এবং মন্দ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাদের কার্যক্রম মনিটর করেন। কিরামান-কাতিবিন এর লিখিত আমলনামা সংরক্ষণ করা হয়। তারা জীবনভর নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নিযুক্ত থাকেন। এই আমলনামা বিচার-দিবসে উন্মুক্ত করা হবে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

‘এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না! আমি সবকিছু শুনছি এবং আমার ফেরেশতা তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে’ (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮০)

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَكْتُبُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾

‘অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে’ (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০-১২)

প্রত্যেক পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে যে তোমার কাঁধে দুইজন ফেরেশতা সার্বক্ষণিক মোতায়ন রয়েছেন। একজন ডান কাঁধে, একজন বাম কাঁধে। বাম কাঁধের ফেরেশতা তোমার মন্দ আমলগুলো এবং ইচ্ছাগুলো সংরক্ষণ করছেন। আর ডান কাঁধের ফেরেশতা তোমার ভালো আমল ও ইচ্ছাগুলো সংরক্ষণ করেছেন। এই বিষয়ের উল্লেখ করে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

‘দুজন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোনো শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা-প্রস্তুত সংরক্ষণকারী উপস্থিত থাকে না।’ (সূরা কাফ, ৫০ : ১৭-১৮)

ছোটদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝিয়ে দিতে হবে, সেটা হলো ফেরেশতারা আমাদের নিয়ত এবং অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘মহামহিম আল্লাহ বলেছেন,

‘আল্লাহ তাআলা সংকাজ ও পাপকাজের সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো সংকাজে সংকল্প ব্যক্ত করেও এখন পর্যন্ত তা সম্পাদন করতে পারেনি, আল্লাহ তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন। আর সংকল্প পোষণের পর যদি উক্ত কাজটি সম্পাদন করা হয়, তা হলে আল্লাহ তার আমলনামায় দশটি নেকী থেকে শুরু করে সাত শ, এমনকি তার চেয়েও কয়েক

গুণ বেশি নেকী লিপিবদ্ধ করে দেন। আর যদি সে কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে ও তা সম্পাদন না করে, তবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি ইচ্ছা পোষণের পর খারাপ কাজটি সে করেই ফেলে, তা হলে আল্লাহ তার আমলনামায় শুধু একটি পাপই লিখে রাখেন।^[৫৮]

এই হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের মানুষের আমলের পেছনে যে ইচ্ছাশক্তি থাকে সেটা অবগত হওয়া ও বোঝার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কাজেই শিশুদেরকে জানাতে হবে যে শুধুমাত্র তোমাদের কাজগুলোই আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় না, বরং চিন্তাভাবনা এবং নিয়ত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

মানুষের তাকদিরে যা লিপিবদ্ধ নেই সে বিষয় থেকে রক্ষা করার জন্য প্রহরী ফেরেশতা মোতায়ন রয়েছেন। তারা আমাদের সামনে এবং পশ্চাতে নিয়োজিত রয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ^৫

‘তাঁর (আল্লাহর) জন্য সবই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তাঁর নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে।’ (সূরা রাদ, ১৩ : ১১)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

‘তিনি নিজের বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান।’ (সূরা আনআম, ৬ : ৬১)

এই প্রহরী ফেরেশতার আল্লাহর আদেশ অনুসারে একজন ব্যক্তির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে থাকেন এবং যখন তাকদিরে নির্ধারিত বিপদ এসে উপস্থিত হয় তখন সেই ব্যক্তির কাছ থেকে নিজেদের সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেন। তারা প্রত্যেক মানুষের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন।^[৫৯]

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের সঙ্গী হিসেবে একজন ফেরেশতাকে মোতায়ন করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ও জিনদের মধ্যে থেকে একজন সাথি নিযুক্ত করা হয়েছে...’^[৬০] সাথে-থাকা-ফেরেশতা মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য, সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার জন্য, মন্দ ও গুনাহের কাজ পরিহার করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন।

[৫৮] বুখারি : ৬৪৯১।

[৫৯] Al-Ashgar, U.S. (2002). The World of the Noble Angels, Riyadh, Saudi Arabia: IIPH, pp. 58-59

[৬০] মুসলিম : ২৮১৪।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আদম-সন্তানের মাঝে শয়তানের প্রভাব রয়েছে এবং ফেরেশতারও প্রভাব রয়েছে। শয়তানের প্রভাব হলো মন্দ কাজে প্ররোচিত করা এবং সত্য অস্বীকার করা। আর ফেরেশতাদের প্রভাব হলো ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং সত্যকে স্বীকার করা...।’^[৬১]

ফেরেশতারা মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করতে থাকেন। আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا

‘তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দুআ করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।’ (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৩)

মুমিন বান্দারা ফেরেশতাদের দুআর বদলৌতে কুফর ও গুনাহের পথ এড়িয়ে আলোর পথ ইসলামে পরিচালিত হওয়ার শক্তি লাভ করেন।^[৬২] এটি জানা থাকলে শিশুরা স্বস্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে এভাবে আমাদের প্রতি রহমত করেন। শিশুদেরকে শেখাতে হবে যে, ফেরেশতারা তাদের মৃত্যুর সময়েও সাথি হয়ে পাশে থাকবেন। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় মালাকুল মউত ও তার সাথে-থাকা-ফেরেশতারা মানুষের জান কবজ করেন। আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

‘এদেরকে বলে দাও, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কবজায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।’ (সূরা সাজদা, ৩২ : ১১)

কাফির ও মুনাফিকদের জন্য এই মৃত্যু খুবই কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُذُنَاؤَهُمْ ﴿١٧﴾

‘সে সময় কী অবস্থা হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করতে করতে নিয়ে যাবে?’ (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৭)

মুমিনদের প্রাণ সহজেই কবজ করা হয়ে থাকে।

الَّذِينَ تَتَوَفَّاَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

[৬১] Al-Ashgar, U.S. (2002). The World of the Noble Angels, Riyadh, Saudi Arabia: IIPH, pp. 66-67; হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযি, আন-নাসায়ি ও ইবনু হিব্বান।

[৬২] Al-Ashgar, U.S. (2002). The World of the Noble Angels, Riyadh, Saudi Arabia: IIPH, pp. 80-83

‘এমন মুত্তাকীদেরকে—যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যখন মৃত্যু ঘটায় তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি, যাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে জাহান্নাতে প্রবেশ করো’ (সূরা নাহল, ১৬ : ৩২)

আমাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা কেমন আকৃতি ধারণ করে আসবেন তা নির্ভর করে মৃত-ব্যক্তির আমলের উপর। যদি মৃত-ব্যক্তি বদ আমলকারী হয় তা হলে ফেরেশতারা কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর আকৃতিতে উপস্থিত হন। তাদের দেহ থেকে বিস্ত্রী দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। তারা কঠোর আচরণ করেন। আর সেই ব্যক্তি যদি উত্তম আমলকারী হয় তা হলে ফেরেশতারা সুদর্শন আকৃতিতে উপস্থিত হন। তাদের দেহ থেকে সুঘ্রাণ ভেসে আসতে থাকে এবং কোমল আচরণে সুসংবাদ প্রদান করেন।

বারযাখের জীবনে প্রশ্নোত্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত দুজন ফেরেশতা হলেন মুনকার-নাকির। তারা মৃত-ব্যক্তিকে প্রশ্নোত্তর করবেন এবং আখিরাতে তার চূড়ান্ত গন্তব্য জানিয়ে দেবেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

‘যখন কোনো বান্দাকে কবরে রাখার পর তার সাথিগণ তার নিকট থেকে ফিরে যায়, আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুতে পায়; তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন (নবি ﷺ-কে দেখিয়ে) —তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলো? তখন ওই ব্যক্তি মুমিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানের দিকে লক্ষ করো—আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার পরিবর্তে জাহান্নামের উত্তম স্থান দান করেছেন। তখন ওই ব্যক্তি উভয় স্থান দেখবে। আর ওই ব্যক্তি কাফির বা মুনাফিক হলে তাকে বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে? তখন সে বলবে, আমি কিছুই জানি না—অন্যরা যেরূপ বলত আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কিছু বুঝতেও পারোনি এবং তুমি (শারীআতের সঠিক জ্ঞান অধিকারীদের) অনুসরণও করোনি। অতঃপর তার কর্ণদ্বয়ের মাঝখানে এক আঘাত করা হবে। তখন সে এমন বিকট চিৎকার করবে, যা মানুষ এবং জিন ব্যতীত অন্য সবাই শুনতে পাবে।’^[৬৩]

কিয়ামাতের দিনে ফেরেশতা ইসরাফিল আলাইহিস সালাম শিংগায় ফুৎকার দেবেন এবং সকল মৃত ব্যক্তিদেরকে কবর থেকে পুনরুত্থান করা হবে।

শিশুদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে—যখন তারা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন বলবে ‘আসসালামু আলাইকুম’। কেননা ঘরে ফেরেশতারাও থাকেন এবং তাদেরকে আমরা সালামের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানাব। আমরা শিশুদের বুঝিয়ে বলব যে, বাড়িতে কুরআন তিলাওয়াত এবং ইসলাম শেখা, তালিম, ইলম অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে

[৬৩] বুখারি

বাড়ির লোকেদের উপর ফেরেশতাদের দুআ আসতে থাকে। ইলম অর্জনের জন্য মাসজিদে গমন করাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘যখন কোনো লোকসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করতে থাকে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (ফেরেশতাদের) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন।’^[৬৪]

যদি আমরা কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাই তা হলেও রহমতের ফেরেশতারা আমাদের জন্য দুআ করতে থাকেন।

রমাদান মাসে আমরা শিশুদের সাথে ফেরেশতাদের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি কারণ রমাদানে একটি বিশেষ রাত রয়েছে—কদরের রাত্রি। এই রাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ফেরেশতারা আসমান থেকে অবতরণ করতে থাকেন। আল্লাহ বলেছেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝

‘কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতারা ও রুহ (জিবরীল) এই রাতে রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়।’ (সূরা কদর, ৯৭ : ৩-৪)

অর্থাৎ, তারা সেই সকল নির্দেশ ও বিধিবিধান-সহ অবতরণ করতে থাকেন, যা আগামী এক বছরের মধ্যে ঘটবে। এটিও ফেরেশতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা সম্পর্কে আমরা শিশুদেরকে জানাতে পারি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিশুদের জানাতে হবে যে, ফেরেশতারা ওই সকল ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে কোনো মূর্তি, প্রাণীর ছবি বা কুকুর রয়েছে। নবিজি বলেছেন, ‘ওই সকল ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না, যেখানে কুকুর বা কোনো (প্রাণীর) ছবি রয়েছে।’^[৬৫] এ হাদীসের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবে যে, আমাদের ঘরে কেন প্রাণীর ছবি প্রদর্শন করা উচিত নয় এবং কেন কুকুরকে ঘরের ভেতরে রাখা যাবে না। যদি ছোটরা এই বিষয়টি বুঝতে না পারে, তা হলে আমরা বড়রা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারি।

ফেরেশতাদের বিভিন্ন ঘটনা ও কাজের কথা শিশুদেরকে বারবার বললে তারা ফেরেশতাদের বাস্তবতা বুঝতে পারবে এবং গায়েবের উপর ঈমান সুদৃঢ় হবে। ছোটরা অদৃশ্যের বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে নাও বুঝতে পারে, কিন্তু তারা তাদের মতো কল্পনা করে বিষয়গুলোকে বুঝে নেয়। ছোট-বয়সে তারা পিতা মাতার কথা খুব কমই অবিশ্বাস করে।

[৬৪] মুসলিম : ২৬৯৯; আবু দাউদ : ৪৯৪৬।

[৬৫] মুসলিম : ২১০৫।

আগ্রহ ও কৌতূহলবশত তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু এই বিষয়গুলোকে তারা সহজাতভাবেই মেনে নেয়। ফেরেশতাদের না দেখতে পেলেও তাদের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। কেননা, কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের হাদীসে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এই বিষয়টি তাদের কাছে অবশ্যই আমরা পৌঁছে দিব। ঈমানের একটি অংশ হলো গায়েবের উপরে বিশ্বাস। ওহির মাধ্যমে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

ফেরেশতাদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের জন্য শিশুদের মধ্যে ফেরেশতাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকৃত ও অনুগত। আমরা যেভাবে আল্লাহর জন্য মুমিনদের ভালোবাসি তেমনিভাবে ফেরেশতাদেরকেও ভালোবাসব। ফেরেশতারাও মুমিনদের ভালোবাসেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন, ক্ষমা-প্রার্থনা করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য করেন।

শিশুদেরকে বোঝাতে হবে ফেরেশতারা আল্লাহর পরিকল্পনা এবং কার্যনির্বাহের অংশ। মানুষের জীবনের সাথে তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই বিষয়ে ঈমানের অনেক উপকারিতা রয়েছে। কেননা, ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি (সাকিনা) নাযিল হয়, তারা মুমিনদের ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করেন। এভাবে আমাদের ঈমান-আমলের মজবুতি লাভ হয়। যখন শিশুরা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করবে তখন তারা আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা বুঝতে পারবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। তারা বুঝতে পারবে, মুমিন বান্দাদের সাহায্য ও উপকার করার জন্য আল্লাহ অনেক ফেরেশতাদের নিয়োজিত করে রেখেছে। তারা অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করেন, দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও হতাশা দূর করেন। সত্যিই ফেরেশতারা আল্লাহর এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি ও মুমিনদের জন্য রহমত।

নবি-রাসূলদের কথা

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

‘রাসূলদেরকে আমি সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কোনো কাজে পাঠাই না। কিন্তু কাফিরদের অবস্থা এই যে, তারা মিথ্যার হাতিয়ার দিয়ে সত্যকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সে-সবকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছো’ (সূরা কাহাফ, ১৮ : ৫৬)

নবি-রাসূলদের উপর ঈমান

ঈমানের আরেকটি মৌলিক উপাদান হলো নবি-রাসূলদের উপরে বিশ্বাস। এটি মুসলিমদের আকীদার একটি মৌলিক উপাদান। নবি-রাসূলদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالتَّائِبُونَ مِنَ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

‘হে নবি! বলো, আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে মানি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকেও মানি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে হিদায়াত দান করা হয়, তার উপরও ঈমান রাখি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৮৪)

যুগে যুগে প্রত্যেক আল্লাহর মিশন বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য নবি-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٥﴾

‘আমি আপনাকে সত্যধর্ম-সহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।’ (সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৪)

কুরআনে পঁচিশ জন নবি-রাসূলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারা হলেন আদম, ইদরিস, নূহ, হূদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, হারুন, মুসা, শূয়াইব, দাউদ, সুলাইমান, আইউব, যুলকিফল, ইউনুস, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং মুহাম্মাদ! তাঁদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নবি-রাসূলদের বিশ্বাস না করে তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٦﴾

‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে কুফরি করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না, আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কউর কাফির। আর এহেন কাফিরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরি করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করবো।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১৫০-১৫১)

রাসূলদের একজনকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করার শামিল। কেননা, নবি রাসূলদের কাউকে অস্বীকার করার অর্থ হলো তাদের বার্তা এবং শিক্ষাকে অস্বীকার করা অর্থাৎ তারা যার বার্তা বহন করেছেন তাকে অস্বীকার করা। এর অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা। নবি-রাসূলদের অস্বীকার করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করতে ব্যর্থ হয়। অথচ আল্লাহর ইবাদাত করা বাধ্যতামূলক।

মানুষ বিভিন্ন কারণে নবি-রাসূলদের শিক্ষার মুখাপেক্ষী। অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জন, আত্মাকে আলোকিত করা এবং মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, জীবনে সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য, আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য নবি-রাসূলদের প্রয়োজন। মানুষের জন্য নবি-রাসূল ও তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করে বিখ্যাত আলেম ইবনু কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ চমৎকারভাবে লিখেছেন :

‘এ কারণে আমরা জানি, সবকিছুর উপরে সবাইকে রাসূল ও তাঁর রিসালাত (বার্তা) সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর আনীত বিষয় বিশ্বাস করতে হবে, আদেশ মানতে হবে। কেননা, দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-সফলতা অর্জনের জন্য রাসূলদের দেখানো পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তারা ব্যতীত অন্য কারও কাছ থেকে ভালো-মন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার সুযোগ নেই। তাঁদের শিক্ষা ব্যতীত কেউ কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। একমাত্র তাঁদের হিদায়াত ও শিক্ষার মাধ্যমেই উত্তম কথা, উত্তম আমল ও আখলাক অর্জন সম্ভব। তাঁরাই সর্বোত্তম আদর্শ। আমাদের আচার-ব্যবহার ও আমলকে তাদের কথা ও কাজের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। তাঁদেরকে অনুসরণের মাধ্যমে বিদআতিদের থেকে সুন্নতের অনুসারীরা পৃথক হয়। দেহের জন্য আত্মা, চোখের জন্য আলো কিংবা রুহের জন্য প্রাণ যতটা জরুরি, আমাদের জন্য তাঁরা তার থেকেও বেশি জরুরি। তাদের প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে আমরা যতই চিন্তা করি না কেন, একজন ব্যক্তির জন্য রাসূলের অপরিহার্যতা তার থেকেও অনেক অনেক বেশি। কেননা, দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ব্যক্তির সুখ নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিদায়াতের উপর। যে ব্যক্তি নিজের প্রতি সত্যবাদী, যে সুখ ও মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষী, তাকে অবশ্যই তার নবির শিক্ষা ও জীবনী জানতে হবে। এভাবে একজন ব্যক্তি মুর্খদের থেকে নিজেকে পৃথক করে ও নবির অনুসারীদের মাঝে शामिल হতে পারে।’[৬৬]

নবিদের উপর ঈমানের একটি লক্ষ্যণীয় দিক হলো তাঁরা সকলেই একই দীন—ইসলাম-এর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এই বিষয়টি নিশ্চিত করে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١١﴾

‘ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা এ দীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোনো কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের উপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর হিদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি হয় না।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৯)

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٦﴾

‘তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন করো, তবে আমি তোমাদের কাছে কোনো রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হলো আল্লাহর দায়িত্বে। আর

[৬৬] ইবনু কায়্যিম রচিত ‘যাদুল মায়াদ’ গ্রন্থ হতে সংক্ষেপিত, Al-Ashgar, U.S.(2002), The Messengers and the Messages in the Light of the Quran and Sunnah, Riyadh, Saudi Arabia: IIPH, pp. 55-56.

আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি।’ (সূরা ইউনুস, ১০ : ৭২)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٣﴾

‘স্মরণ করো, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, অনুগত হও। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩১)

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٧٤﴾

‘আর মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই উপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হও।’ (সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৪)

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٧٥﴾

‘যখন ঈসা অনুভব করল, বানী ইসরাঈল কুফরি ও অস্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে, সে বলল, কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৫২)

কার্যত, ইসলাম বা আত্মসমর্পণ হলো একটি সাধারণ শব্দ যা অতীত থেকে শেষ পর্যন্ত সব নবিরাই ব্যবহার করেছেন।

সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবি ও রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি নবিদের সিলমোহর। তার পরে আর কোনো নবি আসবেন না।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٧٦﴾

‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।’ (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪০)

অন্যান্য নবির নিদিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী এবং নির্দিষ্ট যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একমাত্র নবি ও রাসূল যাকে কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত মানবজাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। নবির উপর নাযিলকৃত কিতাব কুরআনকে আল্লাহ কিয়ামাত পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তিনি বলেছেন,

‘আমি আদম-সন্তানদের সরদার, এতে আমার কোনো অহংকার নেই। কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্য জমিন বিদীর্ণ হবে (কবর থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠব), এতে আমার কোনো অহংকার নেই। আমিই হবো সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফাআত কবুল করা হবে, এতে আমার কোনো অহংকার নেই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে, এতে আমার কোনো অহংকার নেই।’^[৬৭]

তাকে আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ এবং নিয়ামাত দান করেছেন।

তিনি বলেছেন,

‘আমাকে ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে অন্যান্য নবিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে;

- (১) আমাকে কম শব্দে অধিক অর্থবোধক কথা বলার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।
- (২) এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।
- (৩) আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।
- (৪) আমার জন্য মাটিকে মাসজিদ ও পবিত্রতা অবলম্বনের উপকরণ করা হয়েছে।
অতএব আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির সামনে যেখানেই সালাতের সময় উপস্থিত হয়, সে সেখানেই সালাত আদায় করতে পারে।
- (৫) আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোনো নবিকে দান করা হয়নি।
- (৬) আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পূর্বের প্রত্যেক নবি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।’^[৬৮]

নবি-রাসূলদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন

বিভিন্ন গল্প ও ঘটনা বলার মাধ্যমে শিশুদেরকে যেভাবে আমরা ফেরেশতাদের সাথে পরিচিত করার পদ্ধতি আলোচনা করেছি ঠিক একইভাবে নবিদের সাথেও শিশুদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। নবি-রাসূলদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআনে অনেক বর্ণনা এসেছে। এ বিষয়ে ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন ইসলামি গ্রন্থ সহজলভ্য। খেলাধুলা, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের শেখানোর পদ্ধতিকে মজাদার করা যায়। এই তথ্যগুলো শিশুর সামনে নিয়মিত উন্মুক্ত করতে হবে। বিশেষত যেন নবিজি (ﷺ)-এর প্রতি তার অন্তরে ভালোবাসা জন্মায় সেটা শিক্ষা দিতে হবে।

[৬৭] আহমাদ : ১০৯৮৭, তিরমিযি : ৩৬১৫ ইবনু মাজাহ : ৪৩০৮।

[৬৮] মুসলিম : ৫২৩; তিরমিযি : ১৫৫৩।

শিশুদেরকে বোঝাতে হবে যে নবি-রাসূলরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি রহমত। কারণ তাঁরাই আল্লাহর বার্তা এবং ইসলামকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই মহান দায়িত্বের জন্যে আল্লাহ তাঁদেরকে সমস্ত মানুষদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা বিশেষ ব্যক্তিত্ব। দুনিয়াতে আমাদের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে এ ব্যাপারে তাঁরা সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। শিশুদের জন্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ রোল মডেল।

শিশুরা নবিদের ঘটনা আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শুনবে। নূহ আলাইহিস সালাম-এর মহা প্লাবন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা—মূর্তি ভাঙার কারণে কীভাবে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা—কীভাবে তিনি ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, ইউনুস আলাইহিস সালাম কীভাবে মাছের পেটে ছিলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কীভাবে পরিবারের সাথে মিলিত হয়েছিলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির সাথে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে। এগুলো খুবই আগ্রহ-উদ্দীপক। কেননা, স্বয়ং কুরআনের মাধ্যমে সেগুলো সংরক্ষিত হয়েছে এবং ঘটনাগুলো সত্যায়ন করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্যে বিশেষ ভালোবাসা এবং মায়া প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে থাকতে হবে। নবিজিকে ভালোবাসা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। শিশুদের শেখাতে হবে যেন তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিজেদের জীবন এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকেও বেশি ভালোবাসতে পারে। একমাত্র আল্লাহর পরেই নবির ভালোবাসার স্থান। আল্লাহ বলেছেন,

‘নিঃসন্দেহে নবি ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকারী, আর নবিদের স্ত্রীগণ তাদের মা। কিন্তু আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সাধারণ মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়রা পরস্পরের বেশি হকদার। তবে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার (করতে চাইলে তা) তোমরা করতে পারো। আল্লাহর কিতাবে এ বিধান লেখা আছে’ (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬)

নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

‘আমি তোমাদের কারও কাছে তার সন্তানসন্ততি, তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না।’^[৬৯] আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম বলেছেন, আমরা একদা নবি (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমার ইবনুল খাত্তাবের হাত ধরেছিলেন। উমার তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবিজি বললেন, ‘না, ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমনকি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে।’ তখন উমার বললেন, ‘এখন! আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়।’

[৬৯] বুখারি : ১৫; মুসলিম : ৪৪।

নবিজি বললেন, 'হে উমার! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।' [১০১]

শিশুকে বোঝাতে হবে যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসা নির্ভর করে ঈমানের মাত্রার উপর। যখন ঈমান বৃদ্ধি পাবে তখন নবিজির প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং বিপরীত ক্ষেত্রে পরিপূরক ঘটনা ঘটবে। এভাবে নবিজির প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ঈমান ও আন্তরিকতা পরিমাপ করা যায়।

নবিজিকে ভালোবাসা হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। এই ভালোবাসা এবং ভক্তির সাথে শিশুকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার বিষয়টি শিখিয়ে দিতে হবে। যখনই তার নাম উচ্চারিত হবে, দরুদ পাঠ করতে হবে। এটি আল্লাহর নির্দেশ। তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ①

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবির জন্যে রহমতের দুআ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।' (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৬)

এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানলাম আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবির প্রতি দরুদ পেশ করেন এবং মুমিনদেরকেও অনুরূপ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ কারণে আমরা সদা সর্বদা তার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করি।

নবিজিকে ভালোবাসার আরেকটি মাধ্যম হলো তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ও আনুগত্য করা। আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমাকে অনুসরণ করো, তবে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।' (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩১)

এখানে অনুসরণের অর্থ তাকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান, আনুগত্য এবং অনুকরণ করা। মানুষের জন্য সকল বিষয়ে সর্বোত্তম মডেল হলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)। শিশুদেরকে নবিজির শিক্ষা ও আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

‘হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তা হলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো। এটিই সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯)

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটিতে আলোকপাত করে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাজিল হয়েছে। রাসূলের আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা।

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿٦٠﴾

‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, যাই হোক, তাদের উপর তো আমি তোমাকে পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৮০)

উপরন্তু নবিজি (ﷺ) বলেছেন, ‘যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো।’^[৭১]

বাস্তবিক অর্থে, শিশুদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি দিকে রাসূলের সুন্নাহ শিক্ষা দিতে হবে। হাদীস শিক্ষা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা সম্ভব। কুরআনের পাশাপাশি হাদীস মুখস্ত করতেও শিশুদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সংক্ষিপ্ত হাদীসগুলো দিয়ে এই কার্যক্রম আমরা শুরু করতে পারি। হাদীসের অর্থের দিকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সকল কথা এবং কাজে নবির সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে যেন সারা জীবনভর সেই পথে শিশু চলতে পারে। খাওয়া-ঘুম, সালাত, কাজ, এমনকি খেলার সময়েও অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণকে বাস্তবায়িত করতে হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুন্নাহতে নির্দেশিত দুআগুলো মুখস্থ করতে হবে।

যখন শিশুরা বিভিন্ন সুন্নাহ অনুসরণ করবে এবং মাসনুন পাঠ করবে তখন তাদেরকে আমরা উৎসাহের সাথে স্মরণ করিয়ে দিব; ‘তোমরা নবির সুন্নাহ অনুসরণ করছ!’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হলেন আমাদের সর্বোত্তম রোল মডেল।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা সমস্যার মুখোমুখি হলে শিশুদেরকে উৎসাহিত করতে হবে; ‘তোমরা তোমাদের সমস্যার সমাধান কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে খুঁজে বের করো!’ এই দুই উৎসে আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান, দৃষ্টান্ত, হিদায়াত ও

[৭১] বুখারি : ৭১৩৭; মুসলিম : ১৮৩৫।

নির্দেশনা রয়েছে। এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করা জীবনের সর্বোত্তম বিষয়। যদি সেখানে সরাসরি সমাধান না পাওয়া যায় তবুও কিছু ইঙ্গিত এবং দিক-নির্দেশনা অবশ্যই পাওয়া যাবে। সে অনুসারে আমল করতে হবে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সুন্নাহ মোতাবেক ইস্তেখারার সালাত আদায় করতে হবে।

শিশুমনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য তাঁর জীবনী (সীরাত) জানা অপরিহার্য। এজন্য বাড়িতে নিয়মিত ভিত্তিতে স্টাডি সার্কেল ও তালীমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্ততপক্ষে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি পাঠচক্র আয়োজন করা জরুরি। আরবি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষাতে এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ সহজলভ্য। শিশুর বয়স এবং বিকাশ অনুসারে উপযুক্ত বই নির্বাচন করতে হবে।

সীরাতে মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের চরিত্র, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর প্রচারিত বার্তা এবং তাঁর ত্যাগ-কুরবানি সম্পর্কে জানতে পারব। মুসলিমদের সুরক্ষা প্রদানে, ইসলাম প্রচারে তার বীরত্ব, সাহসিকতা ও সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারব। অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার (মুজিয়া) খবর জানতে পারব যার মাধ্যমে আল্লাহ বাকি মানুষের কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনিই তাঁর নির্বাচিত নবি ও রাসূল। শিশুরা সাহাবিদের ঘটনা সম্পর্কেও জানতে পারবে। কীভাবে তাঁরা নবিজির দাওয়াত কবুল করেছেন, আদেশ পালন করেছেন এবং তাঁকে ও তাঁর আনীত দীন রক্ষা করতে জিহাদ করেছেন।

এগুলো জানার মাধ্যমে নবিজির প্রতি শিশুদের ভালোবাসা, নৈকট্য এবং ঈমান বৃদ্ধি পাবে। তাঁকে না দেখেও তাঁর নিকটবর্তী হতে পারবে এবং নিজের জীবনে তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে। কুরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক জোরদার হবে। হাদীস এবং সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা লাভ করবে। সারকথা, তাদের আবেগ জাগ্রত হবে এবং তাদের ঈমান, মন-প্রাণ ও আত্মায় এক আশ্চর্যজনক প্রভাব সৃষ্টি হবে!

অধ্যায় নয়

আসমানি কিতাব এবং ওহি

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘সর্বোত্তম কথা রয়েছে আল্লাহর কিতাবে, আর সর্বোত্তম পথ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পথ।’^[৭২]

আসমানি কিতাব এবং ওহির ওপর ঈমান

আল্লাহ তাঁর নবি-রাসূলদের কাছে ওহির মাধ্যমে যে-সকল বার্তা প্রেরণ করেছেন সেগুলো সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা ঈমানের চতুর্থ মৌলিক ভিত্তি। আল্লাহ বলেছেন,

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٠﴾

‘হে মুসলমানরা! তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হিদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাদের করোর মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩৬)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَّاهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٣١﴾

‘যেহেতু একরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মাদ এখন তুমি সেই দ্বীনের দিকেই আহ্বান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছে সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না। এদের

বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসারফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব তিনিই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই। একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্র করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে যেতে হবে।’ (সূরা শূরা, ৪২ : ১৫)

নবি-রাসূলদের সকল বার্তা আল্লাহর কাছ থেকে ওহির মাধ্যমে এসেছে। সকল রাসূল একই তাওহীদের বার্তা প্রচার করেছেন অর্থাৎ এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার স্থাপন না করা। এ বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ⑤

‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।’ (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৫)

নবিদের ঘটনায় তাওহীদের দাওয়াতের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে এসেছে,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑥

‘নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আঘাতের আশঙ্কা করছি।’ (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৫৯)

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑦

‘আর ইব্রাহীমকে পাঠাই, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলে, আল্লাহর বন্দেগি করো এবং তাঁকে ভয় করো। এটা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানো।’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১৬)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

‘আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।’ (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৬৫)

وَالَّذِي نَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٦﴾

‘সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভূমিতে চড়ে বেড়াবে। কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে এর গায়ে হাত দিয়ো না। অন্যথায় একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে।’ (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৭৩)

কোনটি সত্যের পথ এবং কোনটি আল্লাহর মনোনীত জীবন-বিধান—সেটিও মানুষের কাছে ওহির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। যখন কেউ আল্লাহর পরিচয় জানতে পারে তখন তার মধ্যে আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর অসম্ভ্রুতি থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এজন্যেই প্রতিদিন প্রত্যেক সালাতে আমরা বলি,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٢﴾

‘আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখাও, সে-সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামাত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।’ (সূরা ফাতিহা, ১ : ৬-৭)

ওহির শিক্ষা মানুষকে সঠিক আচার-আচরণ, আখলাক, আদব এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিচালিত করে।

একজন মুমিন পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে যা নাযিল হয়েছে সেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। এটি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে সেগুলো যখন যে জাতির উপর নাযিল হয়েছিল তাদের জন্যে মানা বাধ্যতামূলক ছিল। বর্তমান সময়ের ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে কোনো মুসলিম বিশ্বাস করে না। কেননা, সেখানে নানাভাবে সংযোজন-বিস্তার, পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। উপরন্তু পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ বিশেষ যুগ ও বিশেষ জাতির মানুষদের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নাযিল হয়েছে। সেগুলো চিরন্তন নয়। আল্লাহ সেগুলো সংরক্ষণের ওয়াদা করেননি, বরং তাদের ধর্মযাজকরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা সেগুলোর বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিজেরা যোগ-বিস্তার করে আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন চূড়ান্ত আসমানি-বার্তা। এর মাধ্যমে তাওরাত-

ইঞ্জিল ইত্যাদি পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের বার্তা রহিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল নবিদের সিলমোহর। তাঁর উপর নাযিলকৃত কুরআনের বার্তা সমস্ত মানবজাতির উপর প্রযোজ্য। এটি অন্যান্য আসমানি কিতাব থেকে ভিন্ন। কেননা, এটি সকল স্থান, সকল যুগ এবং সকল মানুষের উপর সকল পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। এখানে চিরন্তন মানব-প্রকৃতির আলোচনা করা হয়েছে যার কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটে না। বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে সাধারণ আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক আইন-কানুন উল্লেখিত আছে। কোনো-না-কোনোভাবে জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা কুরআনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٧﴾

‘(হে মুহাম্মাদ! এদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছে তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দেবো, এবং এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে আসব। (আর এ সাক্ষ্যের প্রস্তুতি হিসেবে) আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য, যারা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে।’ (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯)

একজন মুসলিম কুরআনকে শুধুমাত্র একটি পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশিকা হিসেবেই বিশ্বাস করে না, বরং এর আদেশ-নিষেধ-সমূহ পালন করে। অন্যান্য আসমানি কিতাবসমূহের বিপরীতে কুরআনকে সুরক্ষার ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ প্রদান করেছেন। এ দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেননি, বরং নিজেই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩٠﴾

‘আর এ বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।’ (সূরা হিজর, ১৫ : ৯)

এই সত্যতার একটি সাক্ষ্য হলো কুরআন লিখিত এবং মৌখিক উভয় অবস্থাতেই সংরক্ষিত আছে। লিখিত গ্রন্থের কোনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই এবং বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কুরআন হিফয করে তাদের অন্তরে সংরক্ষিত রেখেছেন।

ওহি নাযিলের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর পরিচয় প্রদান করা, তাঁর একত্ববাদ ও গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানানো। মানুষের জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। যেমন : ‘আমার স্রষ্টা কে? কে আমার প্রভু, তার

সাথে আমাদের কী ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত, কেন তিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন?' এসব বিষয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে কখনও সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। একজন ব্যক্তি যত আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পাবেন তত আল্লাহকে ভালোবাসেন। তার অন্তরে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সদ্ভ্রম জাগ্রত হয়। আল্লাহর ভয়ের সাথে তাঁর সর্বব্যাপী রহমত ও করুণা সম্পর্কেও তিনি আশাবাদী থাকেন।

ওহির সাথে শিশুদের সংযুক্ত করা

আল্লাহর কালাম এবং মানবজাতির প্রতি চূড়ান্ত বার্তা কুরআনের প্রতি শিশুদের ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এই ভালোবাসা আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার সাথে সংযুক্ত। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতে চায় সে যেন কুরআন পাঠ করে।' [৭৩] নিয়মিত ভিত্তিতে কুরআনের সাথে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয়, ভালোবাসা এবং ভরসা সৃষ্টি হয়। এটি ঈমান পরিচর্যা ও বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

কুরআনের ব্যাপারে অবশ্যই শিশুদের সঠিক আকীদা থাকতে হবে। তাদেরকে শেখাতে হবে যে কুরআন হলো আল্লাহর নাযিলকৃত ওহি, এটি তার কথা ও বক্তব্য। কুরআনের সত্যতা এবং নিখুঁত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা চলবে না। এর প্রতি সন্স্টি হয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ছোটদের জানিয়ে দিতে হবে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কেও যদি কেউ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কটাক্ষ, সন্দেহ বা প্রত্যাখ্যান করে তবে এটি খুবই মারাত্মক বিষয়! একটি আয়াত প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণ কুরআন প্রত্যাখ্যান করার শামিল। এতে একজন ব্যক্তির ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর সম্পূর্ণ ওহির প্রতি কুফরি করে।

ছোটবেলা থেকেই শিশুদের শেখাতে হবে তারা যেন কুরআনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সরাসরি নির্দেশনা দেওয়া এবং নিজেরা করে দেখানোর মাধ্যমে (মডেলিং) কুরআন শিক্ষার সঠিক আদব শিশুদের শেখাতে হবে। তিলাওয়াতের সঠিক সময় ও স্থান নির্বাচন করা একটি জরুরি আদব। বিশেষ করে বাধা-বিঘ্নতা মুক্ত পরিবেশ নির্বাচন করা। বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট কোলাহলমুক্ত স্থান ও পরিবেশকে তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেখানে কেউ এসে বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে না বা হেঁচো করবে না। কিবলামুখী হয়ে উপযুক্ত আদবের সাথে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। তিলাওয়াতের পূর্বে নিয়ত শুদ্ধ রাখতে হবে এবং ওযু করে নিতে হবে। শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয়-প্রার্থনার মাধ্যমে তিলাওয়াত শুরু করতে হবে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿১০১﴾

[৭৩] বায়হাকি : ২২১৯; নির্ভরযোগ্য হাদীস।

‘অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।’ (সূরা নাহল, ১৬ : ৯৮)

কুরআনের প্রতি ভালোবাসা শুধু অন্তর আর জিহ্বার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। শিশু নিয়মিত কুরআন শিখবে ও হিফয করবে। দুই-তিন বছর বয়স থেকেই ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা শুরু করা যায়। এটি অন্যান্য দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজের মতো নয়, বরং কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ। এটাকে দুনিয়া-আখিরাতে ব্যক্তির মর্যাদা উন্নত করার সুযোগ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে।

যারা কুরআন শেখার পেছনে মেহনত করে তাদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলো শিশুদের সাথে শেয়ার করতে হবে। কুরআনের মর্যাদা ও সাওয়াব জানলে শিশুর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়।’^[৭৪] তিনি আরও বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে পারদর্শী হয়, (কিয়ামাতের দিন) সে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা পড়তে গিয়ে আটকে যায়, কুরআন পড়া তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।’^[৭৫]

কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা সম্পর্কে চমৎকার উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ওই লেবুর ন্যায়—যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মুমিন) কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মতো—যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর যে ফাসিক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হান-জাতীয় গুল্মের মতো—যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিষাদযুক্ত (তিক্ত)। আর ওই ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ওই মাকাল ফলের মতো—যা খেতেও বিষাদ (তিক্ত) এবং যার কোনো সুস্বাদুও নেই।’^[৭৬]

তিলাওয়াত এবং মুখস্ত করার পাশাপাশি শিশুদেরকে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে হবে। অর্থ না বোঝে তিলাওয়াতে অবশ্যই সাওয়াব রয়েছে কিন্তু সেটা সীমিত। অপরদিকে যে ব্যক্তি অর্থ বোঝে তিলাওয়াত করে সে আরও ব্যাপক পুরস্কার লাভ করে।

[৭৪] বুখারি : ৫০২৭।

[৭৫] বুখারি : ৪৯৩৭।

[৭৬] বুখারি : ৫৪২৭; আবু দাউদ : ৪৮২৯।

কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা করা, আয়াতে বর্ণিত দিক-নির্দেশনা ও হিকমাহ ধারণের চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেছেন,

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا ۝

‘তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?’

(সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪)

কিছু উলামায়ে কেরাম বলেছেন অর্থ না বুঝে অধিক তিলাওয়াত অপেক্ষা অর্থ বুঝে অল্প তিলাওয়াত উত্তম। অর্থ বোঝা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জীবনে প্রয়োগ করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিশুদেরকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে তিলাওয়াতের সময় কুরআনের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখতে হবে। আর এটাই নবিজির পদ্ধতি। যখন এমন আয়াত সামনে আসবে যা সে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেনি, তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং নিজের অবস্থা উন্নতির জন্য সাহায্য কামনা করবে। যখন রহমতের আয়াত পড়বে তখন আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ করবে, যখন শাস্তির আয়াত পড়বে তখন আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। এভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

‘সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে।’ (সূরা আনফাল, ৮ : ২)

কুরআন শিখতে হলে আরবি ভাষা শেখা অপরিহার্য। পিতা-মাতার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব সন্তানকে আরবি ভাষা শেখানো। যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে সে ভাষা না শিখলে কোনো ব্যক্তি কখনোই সত্যিকারভাবে কুরআনের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে না। কুরআনের অনুবাদ থেকেও উপকৃত হওয়া যায়, কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, বক্তব্যের তীব্রতা, মাধুর্য অনুবাদে ফুটে ওঠে না। আরবি ভাষা পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার থেকে শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ। এই অসামান্য উপহার লাভ করে মুসলিমরা গর্বিত। ছোটবেলা থেকে আরবি ভাষা শিখলে সে জীবনভর এই উপহারে থেকে বরকত লাভ করতে থাকে।

কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনি, ঘটনা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুরা কুরআন অনুধাবনের সূচনা করতে পারে। নবি-রাসূলদের কাহিনিগুলো খুবই সরলভাবে বর্ণিত এবং ছোটরা সেগুলো বুঝতে পারে, মূল্যায়ন করতে পারে। নবিদের কাহিনি সমস্ত

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, সূরা ইউসুফে পূর্ণাঙ্গভাবে উটসূর আলহিহিস সালাম-এর কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং মর্মস্পর্শী ঘটনা—মূল্যবান শিক্ষায় ভরপুর। কুরআনে আরও অনেক চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে; যেমন সূরা কাহাফে রয়েছে দুই ব্যক্তি ও তাদের বাগানের ঘটনা। শিশুদেরকে অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে এগুলো কোনো লোককথা বা বানোয়াট ঘটনা নয়, বরং এগুলো বাস্তব ঘটনা যা পূর্ববর্তী নবিদের সাথে ঘটেছে। মুসলিম হিসেবে এগুলোর সত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি এবং দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি। কেননা, আল্লাহর কিতাবেই এগুলো সংরক্ষিত আছে। এ সকল ঘটনা ও দৃষ্টান্তে সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। এই ঘটনাগুলো শিশুরা শৈশব থেকেই জানতে শুরু করবে, আর বড় হওয়ার সাথে সাথে আরও ব্যাপক ও গভীর অর্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু প্রাথমিক ভিত্তিটা শৈশবেই গড়ে দিতে হবে।

কুরআনের হুকুম-আহকাম ও হিদায়াত অনুসারে নিজের জীবনকে পরিচালনা করার শিক্ষাটাও শিশু-কিশোরদের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত হিদায়াতের আনুগত্য না করে তা হলে কোনো ফায়দা নেই। আবু আবদুর রহমান বর্ণনা করে বলেছেন, ‘রাসূলের যে সাহাবিগণ আমাদের কুরআন শেখাতেন, তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা দশটি করে আয়াতের অর্থ, জ্ঞান ও আহকাম শিক্ষা লাভ করতেন। এরপর পরবর্তী দশ আয়াত শিখতেন। তারা বলেছেন, ‘ফলে আমরা ইলম শিখেছি ও আমল করার পদ্ধতি জেনেছি।’^[৭৭] এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘দশটি করে আয়াতের অর্থ ও আমলের উপায় না জেনে আমরা পরবর্তী আয়াত শিখতাম না।’ এক্ষেত্রে শিশুদের সামনে পিতা-মাতা নিজেদেরকেই রোল মডেল হিসেবে পেশ করতে পারেন।

এ বিষয়টি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, একজন ব্যক্তির সম্মান এবং মর্যাদা নির্ভর করে কুরআনের সাথে সংযুক্ত থাকা এবং সেগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করার উপর। জীবনে প্রকৃত সুখ অর্জিত হয় ইসলামের পথে চলার মাধ্যমে। কুরআন সেই পথের আলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘হে লোকেরা! জেনে রাখো, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ। অচিরেই আমার রবের পক্ষ থেকে মৃত্যুদূত এসে হাজির হবে এবং আমিও আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও মুক্তির সঠিক পথের দিশা। এতে রয়েছে নূর ও আলোকবর্তিকা। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে ধারণ করবে এবং তাঁর বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে...’^[৭৮]

[৭৭] আল-ইতকান : ২/৭৪

[৭৮] মুসলিম : ২৪০৮।

সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান নিয়ামত প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে অন্যান্য মানুষদের থেকে তারা আলাদা হবে। আল্লাহর চোখেও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

‘আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝো না?’ (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই লোকেদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে বিশিষ্ট।’ তারা বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কারা?’ তিনি বললেন, ‘তারা কুরআনের লোক—তারা আল্লাহর অনুসারী ও তাঁর জন্যে সুনির্দিষ্ট।’^[৭৯]

কুরআন মানুষের জীবনে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং আল্লাহর রহমত নিয়ে আসে। নবিজি বলেছেন,

‘কোনো ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই ওসিলায় তার জন্যে জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন। যখন লোকজন আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্য হতে কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন।...’^[৮০]

সূরা আর রহমানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে মানুষের জন্যে কুরআন প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾

‘করুণাময় আল্লাহ! শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ,...’ (সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ১-৩)

সুতরাং নিজের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ লাভ করা আল্লাহর রহমতের একটি অংশ। বস্তুত এটি পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি সর্বোচ্চ অনুগ্রহ। কুরআন তাদের সমস্ত জীবনের আলোকবর্তিকা এবং পথনির্দেশিকা হয়ে সুরক্ষা প্রদান করবে। কুরআনের আয়াতসমূহ উপদেশ (তাযকিরাহ) হয়ে তাদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে এবং ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হতে সাহায্য করবে।

[৭৯] আহমাদ : ১২২৯২; ইবনু মাজাহ : ১৭৯; উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস।

[৮০] মুসলিম : ২৬৯৩।

অধ্যায় দশ

বিচার-দিবস এবং আখিরাতের জীবন

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

‘তারপর একটি শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং সাহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে। একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এবং সবকিছু আমার সামনে হাজির করে দেওয়া হবে। ভীত হয়ে বলবে, আরে কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রামহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করাল?—এটা সে জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রসূলদের কথা সত্য ছিল।’ (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫১-৫২)

বিচার-দিবস এবং আখিরাতের উপর ঈমান

পুনরুত্থান-দিবস এবং আখিরাতের উপরে ঈমান হলো ঈমানের পঞ্চম রুকন। এর মধ্যে আখিরাতের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত; যেমন : কবরে প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হওয়া, এরপর সেখানে পুরস্কার বা আযাব লাভ করা, কিয়ামাত, পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে একত্র হওয়া, আমলনামা উপস্থাপন, হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য যা-কিছু আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন—সবকিছুর উপর ঈমান এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সবকিছুর উপরে মুসলিমরা ঈমান রাখেন। সেখানে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করেন না। কুরআনের অসংখ্য স্থানে বিচার-দিবসের আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكَتَابُ وَالنَّبِيِّينَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّابِقِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
النَّاسِ وَالظَّرَاءِ وَحِينَ النَّاسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

‘তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। বরং সংকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামাতের দিন, ফেরেশতা, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবিদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ—আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিরের সংগ্রামে সবার করবে, তারাই সং ও সত্যপ্রিয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٧٨﴾

‘হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরি করল, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলে।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৬)

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿٧٩﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ
بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿٨٠﴾

‘কিয়ামাত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি প্রাণসত্তা তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে ওই সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।’ (সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৫-১৬)

গায়েব বা অদৃশ্য জগতের বিষয়বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে বিচার-দিবস সম্পর্কে। এর বিভিন্ন নাম প্রদান করা হয়েছে। বিচার-দিবসের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখিত বিচার-দিবসের কিছু নামের মধ্যে রয়েছে—সমবেত হওয়ার দিন, উত্থান-দিবস, আল-কারিয়াহ (কড়াঘাতকারী শব্দ), গাশিয়াহ (আচ্ছন্নকারী) ইত্যাদি।

বিচার-দিবসে ঈমানের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেছেন,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨﴾

‘আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামাতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশি সত্য কথা আর কার হবে!’ (সূরা নিসা, ৪ : ৮৭)

رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٩﴾

‘অস্বীকারীরা দাবি করে বলেছেন যে, মরার পরে আর কখনও তাদের জীবিত করে ওঠানো হবে না। তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ! তোমাদের অবশ্যই ওঠানো হবে। তারপর (দুনিয়ায়) তোমরা যা করেছ, তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।’ (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৭)

বিচার-দিবসের প্রতি ঈমান আল্লাহর উপর ঈমানের সাথে সংযুক্ত। আল্লাহ বলেছেন,

‘তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। বরং সংকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামাতের দিন, ফেরেশতা, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবিদেরকে মনে-প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যারা অস্বীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে সবার করবে তারাই সৎ ও সত্যপ্রিয় এবং তারাই মুত্তাকী।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৭)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾

‘তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার পর যখন তারা ইদত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত-পদ্ধতিতে পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ কখনও গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র

পদ্ধতি। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩২)

শুয়াইব আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির লোকদের বলেছিলেন,

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْبُدُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٢٣﴾

‘আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল,
হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, শেষ-দিবসের আশা রাখো
এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোরো না।’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৩৬)

আল্লাহর উপর ঈমানের সাথে বিচার-দিবসে ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এ
ব্যাপারে আরও অনেক উদাহরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত আছে।

আখিরাতের জীবন, বিচার-দিবস ইত্যাদি স্মরণিকাগুলো একজন মুমিনের চিন্তা-
চেতনা ও আচার-আচরণে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাকে হিসাব
প্রদানের জন্য ডাকা হবে, বিচার করা হবে—সে তাকওয়া, সততা, ন্যায্য ও কল্যাণের
সীমারেখার ভেতর নিজের আচরণকে পরিচালিত করে। এ কারণে কুরআনের অনেক
স্থানে নেক আমলকে বিচার-দিবসে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٢٤﴾

‘এটি একটা কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ, এর
পূর্বে যা এসেছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এর সাহায্যে তুমি জনপদসমূহের
এ কেন্দ্র (অর্থাৎ মক্কা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করবো যারা
আখিরাতে বিশ্বাস করে, তারা এ কিতাবের উপর ঈমান আনে এবং নিজেদের
নামাযগুলো নিয়মিত যথাযথভাবে হেফাজত করো।’ (সূরা আনআম, ৬ : ৯২)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٥﴾

‘এসব লোকের কর্মপদ্ধতিতে তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের
প্রত্যাশী লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। এ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়
তা হলে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসিত।’ (সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৬)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ

يَتَرَدَّدُونَ ﴿١١﴾

‘যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনও তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভালো করে জানেন। এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান।’ (সূরা তাওবাহ, ৯: ৪৪-৪৫)

এভাবে আখিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে একজন মুমিন ব্যক্তি পৃথক হয়। যে আখিরাতে অস্বীকার করে সে দুনিয়ার সুখশান্তি, বিলাসিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পড়ে থাকে। আল্লাহ বলেছেন,

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿١٢﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿١٣﴾

‘তারা বরং বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তোমাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। এরপর অস্বীকারকারীরা বলতে শুরু করল, এটা তো বড় আশ্চর্যজনক কথা! আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তখন কি আমাদের ওঠানো হবে)? এ প্রত্যাবর্তন তো যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী।’ (সূরা কাফ, ৫০: ২-৩)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿١٤﴾

‘এরা বলে : জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোনো জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে’ (সূরা জাসিয়াহ, ৪৫: ২৪)

বিচার-দিবস অস্বীকার করলে মানুষের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হতে থাকে। যে ব্যক্তি আখিরাতে তথা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে সে কার্যত সবকিছুর উপর কুফরি করে, সকল নবি-রাসূলদের উপর কুফরি করে। কেননা, তারা প্রত্যেকেই এই বিষয়ে মানুষকে সাবধান করেছেন। আখিরাতে অস্বীকারকারী কাফিরদের আলোচনা করে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۖ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِظُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۝

‘তারা বলে, আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করে ওঠানো হবে?’ বলুন, তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। অথবা তার চেয়েও বেশি কঠিন কোনো জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে? জবাবে বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেন। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, তা হলে এটা কবে হবে? তুমি বলে দাও, অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।’ (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৯-৫১)

বিচার-দিবস এবং আখিরাতেব সাথে শিশুদের সংযুক্ত করা

শিশুদের নানাভাবে আখিরাতেব ঈমানের সাথে সংযুক্ত করা যায়। আখিরাতেব বিষয়ে কুরআনে অনেক আলোচনা রয়েছে। ফলে কুরআনের মাধ্যমে এই বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশুরা তাদের বয়স অনুসারে মৃত্যু, পুনরুত্থান, আখিরাতেব বিষয়গুলো বুঝতে পারে এবং স্বীকার করে নেয়। বাড়িতে এ বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সাথে সহজভাবে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত এমনভাবে পেশ করেছেন যেগুলো মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি বিশেষভাবে কার্যকরী। কেননা, কুরআনে দুর্বোধ্য বিষয়কে দৃশ্যমান উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সহজাতভাবেই শিশুরা ভালো চিন্তাশীল। ফলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে তারা সহজে আখিরাতেব বাস্তবতা বুঝতে পারে। যখন তারা বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে যায় তখন দুর্বোধ্য ধারণা বোঝার ক্ষমতা আরও উন্নত হয়।

মৃত্যুর পরের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যদি প্রথম বার আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারেন তা হলে পরবর্তীকালে আবার সৃষ্টি করা তো আরও সহজ! শিশুদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে আল্লাহই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্ব প্রদান করেছেন, তার কাছেই তাদেরকে ফেরত যেতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۝ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝

‘মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হওয়ার পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো?
মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতঃপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন
কিছুই ছিল না?’ (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৬-৬৭)

আল্লাহ মানুষকে তার সৃষ্টির শুরুর কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّظْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيْجٍ ۝ۙ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ۚ وَأَنَّ
السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۝ۛ

‘হে লোকেরা! যদি তোমাদের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ
থাকে, তা হলে তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে,
তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে,
যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীনও, (এ আমিই বলছি), তোমাদের কাছে
সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত
গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি,
(তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে
যাও আর তোমাদের কাউকে কাউকে তার পূর্বেই ডেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং
কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পর
আবার কিছুই না জানো আর তোমরা দেখছে জমিন শুষ্ক পড়ে আছে তারপর
যখনই আমি তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, তখনই সে সবুজ-শ্যামল হয়েছে, স্ফীত
হয়ে উঠেছে এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্গত করতে শুরু করেছে। এসব কিছু
এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের
উপর শক্তিশালী। আর (এ কথার প্রমাণ) যে, কিয়ামাতের সময় অবশ্যই আসবে,
এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে
ওঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে।’ (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫-৭)

এ আয়াতে আল্লাহ পুনরুত্থানের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। খরা-অনাবৃষ্টিতে
জমিন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর আবার সেখানে তিনি প্রাণ সঞ্চার করেন, বৃক্ষলতা উৎপন্ন
করেন। এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থানের সক্ষমতা পেশ করেছেন। এই উপমা
কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا
لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

‘আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে, তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতঃপর আমি যেইমাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি অকস্মাৎ তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যে আল্লাহ এই মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৯)

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٤٠﴾

‘যিনি আসমান থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে।’ (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১১)

শিশুরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর উদাহরণ সহজেই বুঝতে পারে। ফলে এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলো বেশ কার্যকর। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে উৎসাহিত করবেন যেন তারা সৃষ্টিজগতের আশ্চর্য বিষয়গুলো নিয়ে ভাবে। কীভাবে মৃত জমিনে আবার উর্বরতা সৃষ্টি হয়, প্রাণ সঞ্চর হয়—এটি সত্যিই এক আশ্চর্য ঘটনা! অনেক সময় এটাকে আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই, চিন্তা করি না, খেয়াল করি না। ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার একটি নিদর্শন রয়েছে। এর মধ্যেও আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের একটি স্মরণিকা রয়েছে। আল্লাহর নিয়ামাতগুলো নিয়ে বেখেয়াল হওয়া উচিত নয়।

সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগৎ একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন হিসেবে আল্লাহর সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রমাণ করে। আল্লাহ বলেছেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾

‘এরা কি কখনও লক্ষ করেনি আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর এর পুনরাবৃত্তি করেন? নিশ্চয়ই এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহর জন্য সহজতর। এদেরকে বলো, পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো এবং দেখো তিনি কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সব জিনিসের উপর শক্তিশালী।’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১৯-২০)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٣﴾

‘তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তা পুনরাবর্তন করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।’ (সূরা রুম, ৩০ : ২৭)

যে আল্লাহ এত সুবিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এর থেকে ক্ষুদ্র মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? আল্লাহ বলেছেন,

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٧﴾
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٨﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٩﴾

‘যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা। তিনি যখন কোনো কিছুই ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি, যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।’ (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১-৮৩)

সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে যাওয়া, পারিবারিক ছুটি কাটানো ইত্যাদি ঘটনা থেকেও এই আয়াত ও নিদর্শনগুলো সম্পর্কে শিক্ষা নেওয়া যায়। বাড়ির আঙিনাতে বাগানের দিকে তাকিয়ে প্রতিদিন শিশুকে আল্লাহর শক্তি ও সক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। স্কুলে-পাঠিত বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সাথে কুরআনের আয়াত ও হাদীস মিলিয়ে শিশুকে বোঝানো যায়। বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো কেবল আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ! আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের বিপরীতে মানুষের কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই। দুঃখজনকভাবে বর্তমান যুগের অনেক বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জ্ঞানের সাথে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতাকে তারা সংযুক্ত করতে পারেন না।

মৃত্যুর বাস্তবতা থেকে শিশুকে আখিরাতের শিক্ষা দেওয়া

পরিবারের কোনো সদস্য, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুর মৃত্যুতে আমরা শিশুর সাথে মৃত্যু ও পরকালের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই আলোচনার উপলক্ষ হঠাৎ করেই আসে। আগে থেকে ঠিক করে রাখা কিছু নয়। তবে এটি অবশ্যই পরিবেশ পরিস্থিতি এবং শিশুর মানসিক বিকাশের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। যে-কোনো বয়সের শিশুকে আমরা বলতে পারি যে, সবাইকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারা নিজেরাও একদিন মারা যাবে। শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে, মৃত্যুর মাধ্যমে তোমার প্রিয় মানুষটি চিরতরে হারিয়ে যাবেন, কেবল এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র। দুনিয়ার জীবন ছেড়ে দিয়ে আখিরাতের জীবনে ট্রান্সফার হয়েছে। মৃত্যুর পর আমরা

সকলেই একদিন সেখানে ট্রান্সফার হবো। একদিন সবাইকে—পরিবার, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সাথে নিয়ে আমাদেরকে বিচারের দিনে ওঠানো হবে।

এক অর্থে মৃত ব্যক্তির জন্য শোকাহত না হয়ে বরং খুশি হওয়া উচিত যে, তারা তাদের বরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। একটু বড় শিশুদেরকে আমরা মৃত্যুর পরের জীবনের ধাপগুলো সম্পর্কে বলতে পারি। বারযাখের জীবন তথা মৃত্যু ও বিচার-দিবসের মধ্যবর্তী পর্যায় সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন কবরস্থানে নেওয়া যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু কোনো নেতিবাচক বিষয় নয় এবং নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করাও উচিত নয়। শিশুরা ভয় পাবে, দুশ্চিন্তা করবে ইত্যাদি ভেবে মৃত্যুর আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বরং তাদেরকে এই বিষয়ে জানতে ও বুঝতে উৎসাহিত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমিনদেরকে মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘সুখ-শান্তি বিনষ্টকারী বিষয়কে (মৃত্যু) অধিক স্মরণ করো, কারণ দুঃখের সময়ে মৃত্যুর স্মরণ করলে সহজতা অনুভব হয়, আর সুখের সময়ে মৃত্যুর স্মরণ করলে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।’^[৮১]

কুরআনে ঘুমকে ‘ছোট মৃত্যু’ বলে উপমা দেওয়া হয়েছে। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পুনরুত্থানের সমতুল্য। শিশুদেরকে এই দৃষ্টান্তটি আমরা বলতে পারি।

আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٠﴾

‘তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা-কিছু করো তা জানেনা। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়-কাল পূর্ণ হয়। সবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কী কাজে লিপ্ত ছিলো।’ (সূরা আনআম, ৬ : ৬০)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

‘মৃত্যুর সময় আল্লাহই রাহসমূহ নিয়ে নেন, আর যেগুলোর মৃত্যুর সময় আসেনি, সেগুলোও তাদের ঘুমের সময় (নিয়ে রাখেন)। অতঃপর যার মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকরী হয়, তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।’

[৮১] ইবনু হিব্বান : ২৯৯৩, সহীহ।

(সূরা যুমাৰ, ৩৯ : ৪২)

ঘুমের সময় মানুষের রুহকে আল্লাহ নিয়ে নেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তা হলে সেগুলো ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির দেহে ফিরিয়ে দেন অথবা চাইলে তিনি সেগুলোকে নাও ফিরিয়ে দিতে পারেন। ঘুম থেকে ওঠার পরে এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা যে দুআ পাঠ করি সেখানে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঘুম থেকে উঠার পরের দুআটি শিশুদেরকে শেখাতে হবে। সেটি হলো,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَاللَّهِ الشُّكُورُ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যু দেওয়ার পর জীবিত করেন; আর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।”^[৮২]

ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা এই দুআটি পড়ি,

بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

“হে আমার রব! তোমার নামে শয়ন করলাম, আর তোমার অনুমতিক্রমে জেগে উঠব। তুমি যদি আমার সত্তাকে রেখে দাও, তা হলে এর প্রতি করুণা করো; আর যদি ফেরত পাঠাও, তা হলে একে সুরক্ষিত রাখো, যেসব বিষয়ে তুমি তোমার নেক বান্দাদের সুরক্ষা দিয়ে থাকো!”^[৮৩]

এই দুআগুলোর অর্থ শিশুদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিব যেন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়গুলো তারা বুঝতে পারে।

নেককার ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এর মাধ্যমে মুমিনরা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। ঠিক কোন মুহূর্তে মৃত্যু চলে আসবে তা কেউ জানে না! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ হলো সঠিক ঈমানের সাথে ধারাবাহিক ও নিয়মিতভাবে দ্বীনের বাধ্যতামূলক আমলসমূহ পালন করা, নেক কাজে অগ্রগামী হওয়া। সারকথা, মৃত্যুর স্মরণিকা ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়ন ও আত্মসংশোধন করতে সহায়তা করে। আর সর্বদা নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটানো ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা

সন্তান প্রতিপালনের একটি মৌলিক বিষয় হলো শিশুদেরকে দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দেওয়া। তারা তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ এবং একদিন আল্লাহর সামনে সবকিছুর হিসাব প্রদান

[৮২] বুখারি : ৬৩২৫।

[৮৩] বুখারি : ৭৩৯৩; মুসলিম : ২৭১৪।

করতে হবে—এগুলো শিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি। আল্লাহ বলেছেন,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٨﴾

‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী;’ (সূরা মুযাশ্শিল, ৭৪ : ৩৮)

প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কাজের জন্য একাকী হিসাব প্রদান করতে হবে,

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٧٩﴾

‘তিনি আসমান ও জমিনের এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে, সবকিছুর রব। কাজেই আপনি তাঁর বন্দেগি করুন এবং তাঁর বন্দেগির উপর অবিচল থাকুন। আপনার জানামতে তাঁর সমকক্ষ কোনো সত্তা আছে কি?’ (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৫)

সেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের কেউ থাকবে না, তার পক্ষে কথা বলার মতো কেউ থাকবে না, পরিবারের কোনো সদস্য বা বন্ধু তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٨٠﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٨١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٨٢﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

‘সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে—নিজের ভাই, বোন, মা, বাবা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজেকে ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।’ (সূরা আবাসা, ৮০ : ৩৪-৩৭)

সেদিন প্রত্যেকের পক্ষে একমাত্র কাজে লাগবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এবং নেক-আমলসমূহ। এগুলো তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। জবাবদিহিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা শিশুর আচার-আচরণ উন্নয়ন, সংশোধন ও শাসন করার জন্য অমূল্য সম্পদ। আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রত্যেকের নিজের ভেতর থেকে আসতে হয় এবং এটি বিচার-দিবস ও আখিরাতেব ঈমান থেকে সরাসরি উৎপন্ন হয়। শিশুর মনে এই দৃশ্য অঙ্কন করে দিতে হবে যে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির আমলকে ওজন করবেন এবং যাদের নেক আমল ওজনে ভারী হবে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং যাদের নেক আমল হালকা হবে তাদেরকে কোনো পুরস্কার দেওয়া হবে না, তারা ব্যর্থ হবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٣﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

‘আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই হবে নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে যালিম-সুলভ আচরণ চালিয়েছিল।' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮-৯)

দুনিয়ার বাস্তবতা

এভাবে শিশু বুঝতে পারবে দুনিয়ার জীবনের উদ্দেশ্য হলো কেবল পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। দুনিয়ার জীবনকে তারা আখিরাতের প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সামনের কঠিন পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে। সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত ফলের জন্য তারা সংগ্রাম করবে। নেক আমলের পাল্লা ভারী করতে চাইবে। এটি হবে তাদের মৌলিক লক্ষ্য। সর্বদা এই প্রচেষ্টায় তারা নিয়োজিত থাকবে। ফলে এই মৌলিক লক্ষ্যের বিপরীতে দুনিয়াবি অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো গৌণ ও তুচ্ছ হয়ে যাবে।

শিশুদেরকে একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আল্লাহ দুনিয়াতে আমাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করবেন। আমরা সত্যিই আখিরাতের পুরস্কারের যোগ্য কি না, -+ তা আল্লাহ যাচাই করে নিবেন। আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿١﴾

‘তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।’ (সূরা মুলক, ৬৭ : ২)

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾

‘লোকেরা কি মনে করে রেখেছে—আমরা ঈমান এনেছি—কেবল একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২-৩)

নবিজি (ﷺ)-এর জীবনী ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাগুলো এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর। আল্লাহর প্রতি, ঈমান ও ইসলামের প্রতি নিবেদিত হয়ে তারা নানা রকম শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করেছেন।

যখন শিশুরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারবে এবং জানতে পারবে যে একদিন এর ধ্বংস অনিবার্য, তখন দুনিয়ার প্রতি তাদের ভালোবাসা হ্রাস পাবে এবং বস্তুবাদী, ভোগবাদী জীবনের প্রতি আগ্রহ কমে আসবে। আর এটিই সত্যিকারের ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য।

যারা দুনিয়ার জীবনকে নিজেদের ‘জান্নাত’ মনে করে এবং সম্পূর্ণ শ্রম, শক্তি ও

মনোযোগ দিয়ে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরতে চায়, দুনিয়াকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে—মুসলিম পরিবারের শিশু তাদের মতো হবে না। সে দুনিয়াকে ঘিরে মোহগ্রস্ত হবে না, স্বপ্ন দেখবে না, দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা-কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হবে না। দুনিয়ার পিছনে ছুটে নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করবে না। সে তার সময়কে মূল্যায়ন করবে এবং বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর জন্য কাজে লাগাবে। আখিরাতে যে বিষয়গুলো তার জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে সেগুলো সামনে রেখে নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করবে।

দুনিয়ার এই ‘নগদ পরিতৃপ্তির’ (instant gratification) বদলে সে আখিরাতের জন্য সবার করতে শিখবে। সে বুঝতে পারবে আখিরাতের পুরস্কার এর থেকে অনেক বেশি এবং এর কোনো শেষ নেই।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ‘তুমি এমনভাবে দুনিয়াতে থাকো, যেন তুমি একজন মুসাফির।’ পরবর্তী বর্ণনাকারী যুক্ত করেছেন—ইবনু উমার প্রায়ই বলতেন, ‘যদি তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকো তা হলে পরদিন ভোর পর্যন্ত জীবিত থাকার আশা করো না। আর যদি পরদিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকো তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সূস্থতাকে কাজে লাগাও এবং মৃত্যুর পূর্বে এই জীবনকে কাজে লাগাও।’^[১৮]

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নিজেকে মুসাফির মনে করে, সে তার বোঝা হালকা রাখে। নিজের সাথে শুধুমাত্র ততটুকু বহন করে যা তার জন্য অপরিহার্য। নবিজি যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন সেভাবেই আমাদের দুনিয়াতে অবস্থান করা উচিত। অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু জমা করার প্রতি ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। আলোচ্য-হাদীসটি শিশুদের বোঝার উপযোগী একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এর মধ্যে অনেক মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে।

শিশুদের উপযোগী আরেকটি উপমা সামনের হাদীসে উল্লেখিত আছে। নবিজি বলেছেন, ‘দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নাম।’^[১৯] কারাগারের মাধ্যমে এমন স্থানের চিত্র আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে যেখানে আরাম-আয়েশের সুযোগ নেই। একটি বিষয় দমবন্ধ করার মতো পরিবেশ। সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সবাই সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। মুমিনদের দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত অনুরূপ। সে দুনিয়া থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় এবং আখিরাতের প্রত্যাশা করে। কারণ আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য আখিরাতে মহামূল্যবান ও দামি সব বিষয়ের ওয়াদা করেছেন। কাফিরের জন্য এই দুনিয়া হলো জাহান্নাম। কেননা, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার পরোয়া না করে তারা দুনিয়াতে ইচ্ছামতো তৃপ্তি অর্জন করে। তারা কখনও দুনিয়া ছেড়ে যেতে চায় না, কারণ নিজেদের অপকর্মের কারণে আখিরাতের

[১৮] বুখারি : ৬৪১৬।

[১৯] মুসলিম : ২৯৫৩।

চিরস্থায়ী শাস্তির কথা স্মরণ করে তারা আতঙ্কিত থাকে।

আমরা শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলব—আখিরাতের ব্যাপারে সচেতন থাকার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে শান্তি ও পরিতৃপ্তি আসে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘আখিরাত যার একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য—আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দেন। বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে সমাধান করে দেন। দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যার চিন্তা ও লক্ষ্য হয় দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা তার দু-চোখের সামনে অভাব তুলে ধরেন, তার সমস্যাগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন আর যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত সে কিছুই পায় না।’^[৮৬]

যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু চলে আসতে পারে। কাজেই, সকল অবস্থায় আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজেদের সন্তানদের প্রস্তুত করে দিতে হবে। কে জানে, হয়তো-বা আমাদের আগে তারাও মৃত্যুবরণ করতে পারে! এই প্রস্তুতির অংশ হলো ইলম অর্জন করা, নিজেদের ঈমান-আকীদা সংশোধন করা এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কারগুলো স্মরণে রেখে উত্তম আমল করা। আখিরাতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর সাক্ষাৎ ও নৈকট্য লাভ করা। ঈমানের পরিচর্যা ও বিকাশে এর চেয়ে উত্তম পুরস্কার আর কী হতে পারে?

তাকদীর

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لَّكِنَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

‘পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তা সংঘটিত করার পূর্বে একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক, তাতে তোমরা মনঃক্ষুণ্ণ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন, সেজন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।’ (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২-২৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘...জেনে রাখো, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।’^[৮৭]

তাকদীরের উপর ঈমান

এটি ঈমানের ষষ্ঠ ও চূড়ান্ত রুকন। ‘আল ক্বাদা ওয়াল কাদর’ (আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে নির্ধারিত ভাগ্য) বা তাকদীর সম্পর্কে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন, একটি

[৮৭] তিরমিযি : ২৫১৬, সহীহ।

স্থানে তিনি বলেছেন,

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١١﴾

‘আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।’ (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৯)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿١٣﴾

‘নবির জন্য এমন কোনো কাজে বাধা নেই, যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন; ইতঃপূর্বে যেসব নবি অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর নিয়ম, আর আল্লাহর হুকুম হয় একটি চূড়ান্ত স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।’ (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৮)

وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿١٤﴾

‘...যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন; তারপর তার একটি তাকদীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।’ (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২)

অন্যান্য যেসব আয়াতে আল্লাহর জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো তাকদীরের দিকেই ইঙ্গিত করে। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরে ঈমান আনার অর্থ হলো এসব বিষয়ে বিশ্বাস করা।^[৮৮] তাকদীর হলো আল্লাহর বিধান, হুকুম এবং চূড়ান্ত পরিণতি। এর সংজ্ঞায় বলা হয়,

‘...(তাকদীর হলো এমন বিধান) যা পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে, কলমের^[৮৯] মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যখন কলমকে কিয়ামাত পর্যন্ত সংঘটিত সবকিছু লিখতে আদেশ করা হয়েছিল, তখন সেগুলো ঘটার আগেই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে কলম সবকিছু লিপিবদ্ধ করেছে। আল্লাহ জানেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঘটবে, ফলে তিনি যা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো সেভাবেই ঘটে।’^[৯০]

[৮৮] Al-Ashqar, Divine Will and Predestination, pp. 21-23

[৮৯] উবাদাহ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি ততক্ষণ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ-না তুমি অনুধাবন করো যে, তুমি যা পেয়েছ, তা কিছুতেই ফেলতে পারতে না; আর তুমি যা পাওনি, তা অবশ্যই তুমি পাবে না।’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহকে এরূপ বলতে শুনেছি, ‘মহান আল্লাহ সর্ব-প্রথম কলম তৈরি করেন।’ এরপর তিনি কলমকে বলেন, ‘লিখো।’ তখন আল্লাহ বলেন, ‘তুমি কিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি সমস্ত জীবের তাকদীর লিখো।’ ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত মারা যাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ ইমাম আহমাদের আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম, এরপর তিনি বলেছেন, ‘লিখো।’; ‘এবং তখন সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা-কিছু কিয়ামাত পর্যন্ত ঘটবে।’ ইবনু ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর কুফরি করবে সে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।’ (তাবারানি কর্তৃক উক্ত সনদে বর্ণিত)।

[৯০] Aqeedat al-Isfaraeeni as quoted in Al-Ashqar, Divine Will and Predestination, p. 33

ইবনু হাজার লিখেছেন, ‘এর অর্থ হলো, কোনো কিছু ঘটান আগেই আল্লাহ সবকিছুর পরিণতি এবং সংঘটন কাল সম্পর্কে জানেন। এরপর তিনি যা-কিছু ঘটবে সেগুলোকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। ফলে সবকিছু তাঁর সুমহান ইলম, ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে ঘটে থাকে।’ (১১)

তাকদীরের উপর ঈমান চারটি মৌলিক উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত :

১. আল্লাহর সর্বব্যাপী ইলমের উপর বিশ্বাস :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢٠﴾

‘কাফিররা বলে আমাদের উপর কিয়ামাত আসবে না। বলুন কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ! অবশ্যই আসবে। তার কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোনো জিনিস আকাশসমূহেও লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তা চেয়ে ছোটই হোক, সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।’ (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩)

২. কিয়ামাত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে, সবকিছু আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কিতাব) :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢١﴾

‘তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।’ (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭০)

৩. আল্লাহর ইচ্ছা এবং নিখুঁত ক্ষমতার উপর ঈমান—তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে এবং যা ইচ্ছা করেন না তা ঘটে না :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٢﴾

‘তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’; তখনই তা হয়ে যায়।’ (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮২)

৪. আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়—এই বিষয়ের উপর ঈমান :

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٢٧﴾

‘আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।’ (সূরা যুমা, ৩৯:৬২)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٢٨﴾

‘আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।’ (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৯)

এই প্রত্যেকটি রুকনে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাকদীরের উপর ঈমান পরিপূর্ণ হয়।^[৯২] ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, ‘তাওহীদের নির্যাস হলো তাকদীর। যে ব্যক্তি তাকদীরে বিশ্বাস করে এবং এককভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত করে সে তাওহীদকে পরিপূর্ণ করেছে। আর যে ব্যক্তি তাকদীরের উপর ঈমান রাখে না কিন্তু এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে, সে তাওহীদকে কুফরের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে।’^[৯৩]

শিশুদের তাকদীরের ইলম দান করা

সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞান, অনুমতি এবং ইচ্ছার বাইরে ঘটে না। এটিই হলো তাকদীরের উপর ঈমানের কেন্দ্রীয় বিষয়। আল্লাহ কোনো ব্যক্তির জন্য যা ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই ঘটবে এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা কখনও ঘটবে না। তার নির্ধারিত বিধান থেকে বিরত রাখার মতো কেউ নেই; তাঁর উপর প্রভাবশালী কেউ নেই—এই বিষয়গুলো শিশুদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই শিশুদেরকে তাকদীরের প্রতি ঈমানের উপর তারবিয়াহ (প্রশিক্ষণ) প্রদান করতে হবে। তাকদীরের ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে—এই বিষয়গুলো তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

নবিজি (ﷺ) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে তাকদীর সম্পর্কে শিক্ষা-প্রদান করেছেন, অথচ সে সময় তিনি একেবারে ছোট বালক ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস নিজেই হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন,

‘একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, ‘হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাব। আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে, তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই

[৯২] Al-Ashqar, Divine Will and Predestination, p. 37

[৯৩] Majmoo al-Fatawa li Shaykh al-Islam as quoted in Al-Ashqar, Divine Will and Predestination, p. 25

পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখো, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।^[৯৪] অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে: ‘আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করলে তোমার কঠিন অবস্থায় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। মনে রেখো—যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরও জেনে রাখো—ধৈর্যধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কঠিন অবস্থার পর সহজতা আসে।’^[৯৫]

যখন শিশু এই বিষয়গুলো বুঝে বড় হতে থাকবে তখন তার ঈমানে এতটা মজবুতি ও দৃঢ়তা অর্জিত হবে যে এর মাধ্যমে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করতে পারবে। সে নিশ্চিতভাবে জানবে যা-কিছু তাকদীরে নির্ধারিত আছে সেটা অবশ্যই পাবে আর যা-কিছু সে পায়নি তা কখনও তার জন্য নির্ধারিত ছিল না। সে বুঝতে পারবে যদি আল্লাহ তার তাকদীরে কিছু প্রদান করবেন বলে লিখে থাকেন, তা হলে সমস্ত মানবজাতি একত্র হয়েও সেটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আবার সমস্ত মানবজাতি একত্র হয়েও যদি তাকে কিছু প্রদানের চেষ্টা করে, সেটাও পারবে না—যদি না আল্লাহ তাকদীরে প্রদান করবেন মর্মে লিপিবদ্ধ করে থাকেন।

এই ঈমানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি এবং কাপুরুষতা দূর হয়ে যায়, দৃঢ়-সংকল্প ও সাহসিকতা অর্জিত হয়। সে ইসলামের মূলনীতির উপর জীবন অতিবাহিত করতে পারে, কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে—মানুষের ভয়ে সে ভীত নয়। সে ইসলামকে রক্ষা করবে কারণ সে বুঝতে পারে তাকদীরে তার জন্য যা নির্ধারিত আছে তা অবশ্যই ঘটবে। সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে ন্যায় নীতি ও সত্যের অনুশীলনে সে উঠে দাঁড়াবে।

যদি স্কুলে সালাত আদায় করার কারণে তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়, তা হলে সে মোটেও ঘাবড়ে যাবে না, পান্ডা দিবে না। কারণ সে জানে, সে সত্যের পথে রয়েছে এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হিজাব পরিধানের জন্য যদি তাকে উত্থাপ্ত করা হয়, কটু মন্তব্য করা হয়, তবুও সে বেপর্দা হবে না। তাকদীরের উপর ঈমানওয়ালা ব্যক্তি দুনিয়াবি কোনো শক্তি বা ক্ষমতার সামনে নত

[৯৪] তিরমিযি : ২৫১৬।

[৯৫] নূরুল ইকতিবাস : ৩/৯১।

হয় না। কারণ সে জানে, সবকিছুই আসমান ও জমিনের বাবের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনিই চূড়ান্ত কর্তৃত্বশীল!

যখন অপ্রীতিকর কোনো কিছু সংঘটিত হবে তখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এটা আল্লাহর অনুমতিতেই ঘটেছে। আল্লাহ মানুষের জন্য এমন পরিকল্পনা করেন যা মানুষ বুঝতে পারে না। মানুষের সেই বোঝার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা নেই। মানুষ অনেক বিষয়কে নেতিবাচক মনে করে কিন্তু কার্যত সেটা তার জন্য উপকারী ও ইতিবাচক হয়ে থাকে! যেমন আল্লাহ বলেছেন,

كَيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

‘তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৬)

দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনার মধ্যেও অনেক মূল্যবান শিক্ষা লুক্কায়িত থাকে। এই বিষয়গুলো নিয়ে পরিবারে খোলামেলা আলোচনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ; অসুস্থতা মানুষের জন্য একটি বিপর্যয়, কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অসুস্থতাও উপকারী। কেননা, এর মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং আত্মশুদ্ধি ঘটে। যখন শিশু বা পরিবারের অন্য কেউ অসুস্থ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে তারা অসুস্থতাকে মেনে নিতে পারবে এবং ধৈর্যের সাথে সহ্য করতে শিখবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। বিপদাপদে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার প্রতি ফোকাস রাখতে হবে। এখানে আমি আল্লাহর ওয়াদার উপর দৃঢ় বিশ্বাসের একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি। একটি মুসলিম পরিবারে জনৈক শিশু তার দুজন প্রতিবন্ধী (down syndrome) ভাইবোনকে দেখে বলত, ‘এরা দুজন আমার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা!’

আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾

‘আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনও কোনো মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তার অন্তরে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।’ (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১১)

কষ্ট-ক্রেমে গীড়িত ব্যক্তি যখন অনুভব করে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তখন সে হাসিমুখে এগুলো গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাকদীরের উপর ঈমানের পুরস্কার হিসেবে সেই বিপদে আল্লাহ তার অন্তরকে প্রশান্ত রাখেন এবং হৃদয়ে ইয়াকীন প্রদান করেন! এটি সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রেই সত্য—সেটা যত বড় বিপদই হোক না কেন! বর্তমান সময়ে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমবর্ধমানহারে ঘটে চলেছে। তাকদীরের উপর ঈমানের মাধ্যমে শিশুদের সেগুলো বোঝানো যেতে পারে।

শিশুদেরকে সবার ও শোকর শেখাতে হবে। কঠিন সময়ে তারা সবার করবে এবং সহজ সময়ে আল্লাহর নিয়ামাতের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘মুমিনের বিষয়াদি কত আশ্চর্যের! তার সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটা তো কেবল মুমিনের ক্ষেত্রেই হতে পারে। স্বচ্ছলতায় সে শুকরিয়া আদায় করে, তখন তা তাঁর জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ নেমে আসে তা হলে সে সবার করে, ফলে তাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে যায়।’^[১৬]

প্রথমে পিতা-মাতা নিজেদের জীবনে এই বিষয়গুলো প্রতিফলিত করবেন, এরপর শিশুদেরকেও অনুরূপ আচরণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

সবরের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে কুরআনের আয়াতগুলোকে ব্যবহার করা যায়। আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেন তারা ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য-প্রার্থনা করে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য-প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৩)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٤﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٥﴾

‘এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৪-১৫৬)

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ﴿١٥٦﴾ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٥٧﴾

‘বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবারকারী, তাদের অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।’ (সূরা যুমার, ৩৯ : ১০)

যারা ধৈর্যশীলতার সাথে লেগে থাকে তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন এবং তিনি তাদের জন্য বিরাট পুরস্কারের ওয়াদা কবেছেন।

সবর ও শোকরের পাশাপাশি যদি তারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ও হুকুমকে গ্রহণ করতে শেখে ও তার উপরে সম্ভটচিত্ত থাকে তবে এটা তাদের জন্য আরও উপকারী। এটিই একজন মানুষের ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়! সেটাই সত্যিকারের সবর—যখন কোনো নিয়ামাত ও কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তফাত করা হয় না, বরং উভয় অবস্থাকেই সাওয়াব অর্জনের সুযোগ গণ্য করা হয়। সকল পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার মানসিকতাই সত্যিকারের সবর। তাকদীরের উপর ঈমানের মাধ্যমে মানুষের জীবনে সম্ভটি আসে। কেননা, সে বিশ্বাস করে আল্লাহ ঈমানদার বান্দাদের জন্য কেবল উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এভাবে আমরা শিশুদেরকে সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর সম্ভট থাকার শিক্ষা প্রদান করতে পারি।

তাকদীরের উপর ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—শিশুদের কাছে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেওয়া যে আল্লাহর নির্ধারিত ইচ্ছার অধীনে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে। এর মাধ্যমে সে ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে। চাইলে আত্মসমর্পণ করতে পারে অথবা অবাধ্য হতে পারে। যদি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা না হতো তা হলে তিনি বিচারের দিনে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারের মুখোমুখি করতেন না। অনুরূপভাবে, যাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। উদাহরণস্বরূপ, যে-সকল বিষয়ের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সে বিষয়ের জন্য আমরা দায়ী নই, যেমন গায়ের রঙ, উচ্চতা, জন্মস্থান, পিতা-মাতা ইত্যাদি।

যদি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিক যোগ্যতা বা বিচারবুদ্ধি না থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দায়ী করা হবে না। এ কারণে শিশু এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না। মানসিক ভারসাম্যহীন কোনো মানুষকে দেখলে শিশুর সাথে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করতে পারি। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকাল-পার-করা-সন্তানদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করা অধিক উপযোগী।

আল্লাহ আমাদেরকে নির্দিষ্ট মাত্রায় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করেছেন। তবে আমাদের এই ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে কার্যকর হয়ে থাকে। আমরা কোনো কিছু ইচ্ছা করতে পারি না বা অর্জন করতে পারি না, যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছায় তার অনুমতি আমরা লাভ করছি! শিশুদেরকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা খামখেয়ালিপূর্ণ

নয়, বরং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অসীম বিজ্ঞতা, সার্বজনীন আইনকানুন এবং নিখুঁত পরিকল্পনা।

তাকদীরের উপর ঈমানের কিছু উপকারিতা

শিশুদেরকে তাকদীরের উপর ঈমানের উপকারিতা বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকদীরের উপর ঈমানের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হয়। দুঃখ, দুশ্চিন্তা, অসন্তুষ্টি দূরীভূত হয়। এর মাধ্যমে পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত এবং নির্ভর থাকা যায়। কেননা, তখন ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে সবকিছু আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে সংঘটিত হচ্ছে এবং প্রতিটি ঘটনার পেছনে সুমহান হিকমাহ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং হতাশার কোনো কারণ নেই। হাল ছেড়ে দেওয়া বা ভেঙে পড়ার কিছু নেই।

তাকদীরে ঈমানের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে আরও অনেক ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন অনুপ্রেরণা, আত্মবিশ্বাস, সফলতা এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন।

তাকদীরে বিশ্বাসের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সকল ধরনের শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে। একমাত্র আল্লাহকে সে ইবাদাত, সাহায্য-প্রার্থনা এবং ভরসার যোগ্য বলে মনে করে। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা ও আস্থা স্থাপন করে। তিনিই সবকিছুর নিয়মকানুন ও তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। ফলে তাঁর প্রতি সকল ইবাদাতকে একনিষ্ঠ করে। এভাবে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত তাওহীদ অর্জিত হয়। আর তাকদীরের (আল-ক্বদা ওয়াল ক্বাদর) উপর ঈমানের সবচেয়ে বড় পুরস্কার অর্জিত হবে আখিরাতের সফলতার মাধ্যমে।

তৃতীয় পর্ব

শিশুমনে ইসলামি ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে তোলা

শিশুদের ঈমান পরিচর্যার একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাদের মধ্যে ইসলামি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। ইসলামি ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। ফলে ব্যক্তির ভেতর এবং বাহিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হয়। কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, আবেগ-অনুভূতি সবকিছুতে ইসলামি ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। এই ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ। ইসলামি ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের কাজ, চিন্তা ও আবেগকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সহযোগিতা পেলে এটি বিকশিত হবে, সহযোগিতা না করলে বাধাগ্রস্ত হবে। আলোচ্য বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য পিতা-মাতা কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে পারেন, সেগুলো এই পর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিকাশের কিছু সূত্র

শিশুদেরকে ঈমানের রুকনসমূহের সাথে সংযুক্ত রাখার পাশাপাশি আরও কিছু কৌশল রয়েছে যার মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানের ঈমানের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটাতে পারেন। ইসলামি ব্যক্তিত্ব গঠন ও মুসলিম পরিচিতি (identity) সৃষ্টির লক্ষ্যে শুরুতে কয়েকটি পরিভাষার সংজ্ঞা জেনে নেওয়া জরুরি।

ব্যক্তিত্ব (Personality)

ব্যক্তিত্ব হলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি জটিল সমন্বয় যার মাধ্যমে একে অন্যের থেকে পৃথক হয়। এটি ব্যক্তির সামগ্রিক আবেগ, আচরণ এবং কগনিটিভ (সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম) বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টি।

পরিচিতি (Identity)

পরিচিতি হলো বিশ্বাস ও বাস্তব চর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জীবন পরিচালিত হয়। এটি ব্যক্তিকে নিজের সম্পর্কে স্থিতিশীল একটি ধারণা প্রদান করে। ব্যক্তির ধর্ম-বিশ্বাস পরিচিতি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইসলামি আকীদার মধ্যে ব্যক্তির সঠিক ও স্থিতিশীল পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শারীআতের মাধ্যমে ব্যক্তির রীতিনীতি এবং আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

শুরু থেকে শুরু করুন!

এ বিষয়টি বুঝতে হলে আসুন শুরুতেই কয়েকজন সাহাবির ঘটনা জেনে নিই।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন নবিজি মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল তেরো বছর। একজন অল্পবয়স্ক বালক হিসেবে তিনি নবিজির খেদমত করেছেন, তার সাথে বিভিন্ন সফর ও অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং একত্রে সালাত আদায় করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ছায়াসঙ্গীর মতো ছিলেন। সব সময় সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিকাংশ সময়েই বালক আবদুল্লাহকে কাছে রাখতেন, তার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং দুআ করে বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের জ্ঞানে গভীরতা দান করুন এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করুন।’^[৯৭] আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দুআ কবুল করেছেন। পরবর্তী ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই আবদুল্লাহ তার বয়সের তুলনায় অধিক বিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন।^[৯৮]

বালক আবদুল্লাহ নবিজির প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী থাকতেন এবং তার সকল কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর কথাগুলো তিনি মুখস্থ করে নিতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাকে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি পরবর্তীকালে সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক ইলমের অধিকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। ১৬৬০টি হাদীস মুখস্থ করেছেন যার অনেকগুলো বুখারি এবং মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে। আবদুল্লাহর জীবন নিবেদিত ছিল ইলম অন্বেষণ, নিজে শিখতে ও অন্যকে শেখাতে। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ আবিদ ও মুজাহিদ ছিলেন। তিনি অনেক জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছেন।^[৯৯]

আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রদিয়াল্লাহু আনহু

আবদুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি যুবায়ের রদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র যিনি জান্নাতের সুসংবাদ-প্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্যতম। তার মা ছিলেন আসমা বিনতে আবু বাকর যিনি প্রথম মুসলিমদের অন্যতম। হিজরতের পর মুহাজিরদের পরিবারে প্রথম জন্মগ্রহণকারী শিশু ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের। তিনি তার জন্মের পর শৈশব থেকেই নবিজির সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁর জন্মের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি খেজুর চিবিয়ে নরম করে তার মুখে পুরে দিয়েছিলেন। এরপর তার জন্য আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করে দুআ করেছেন এবং নাম রেখেছেন ‘আবদুল্লাহ’। আবদুল্লাহ নবিজির বাড়িতেই দীর্ঘদিন ছিলেন। ফলে তিনি কাছ থেকে তাকে দেখতে পেরেছেন এবং সরাসরি তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে পেরেছেন।^[১০০]

[৯৭] Quoted in “Biographies of the Companions”, USC-MSA Compendium of Muslim Texts, taken from Alim Software.

আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের শৈশব থেকেই খুব সাহসী এবং বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। একবার কিছু ছোট বাচ্চাকে নবিজির কাছে নিয়ে আসা হলো যেন তারা তাঁর কাছে বাইয়াত প্রদান করতে পারে। অন্য বাচ্চারা তখন ভয় পাচ্ছিল। আবদুল্লাহ তাদেরকে ঠেলে সামনে এসে সবার আগে বাইয়াত প্রদান করতে চাচ্ছিলেন। নবিজি (ﷺ) তাকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ‘যেমন বাবা তেমন ছেলে!’

আরেকটি ঘটনায় তার সাহসিকতার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। একদিন আবদুল্লাহ তার বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। এমন সময় সেদিক দিয়ে খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব অতিক্রম করে গেলেন। ছোট বাচ্চারা ভয়ে এদিকে-সেদিকে দৌড়ে পালাতে লাগল। উমরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কারণে সকলেই তাকে ভয় করত কিন্তু আবদুল্লাহ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি পালালেন না। উমার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘অন্য বাচ্চাদের মতো তুমি দৌড়ে পালালে না কেন?’ আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কোনো গুনাহ করিনি আর রাস্তাও এত সরু নয় যে আমাকে সরে গিয়ে আপনাকে জায়গা করে দিতে হবে!’

আবদুল্লাহ এই বীরত্ব আর সাহসিকতার দৃষ্টান্ত যুদ্ধের ময়দানেও স্থাপন করেছেন। এমনকি শৈশবেই তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিছু বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন অথচ সেই সময় তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। দশ বছর বয়সে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তেরো^[১০১] বছর বয়সে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যখন কাফিররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করত, তিনি তাদের উপর আক্রমণ করতেন, আহত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পরিণত বয়সে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ সাহসী বীর যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন।

শিক্ষা

এই দুইজন সাহাবি যারা শিশু বয়সে নবিজির সাহচর্য পেয়েছিলেন—তাদের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথম শিক্ষা হলো আমরা একেবারে ছোট বয়স থেকেই সন্তানদের ঈমানের পরিচর্যা নিতে শুরু করব। তাদেরকে ঈমান ও তাকওয়া শেখাতে শুরু করব। এ বিষয়ে পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে যে শিশুদেরকে জন্মের সময় থেকেই (আযানের মাধ্যমে) আল্লাহ সম্পর্কে জানিয়ে দিতে হবে। শৈশব থেকেই কুরআন এবং হাদীস শেখানো শুরু করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের মুখস্থ করার ক্ষমতা সবচেয়ে শক্তিশালী থাকে শৈশবের বছরগুলোতে। এরপর মস্তিষ্কের বিকাশ এবং বয়স বৃদ্ধির কারণে এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই বিষয় সত্য। শৈশবে ভাষা শেখা অনেক সহজ।

[১০১] Darussalam, Child Companions Around the Prophet. pp. 86-96

শৈশবে মানুষ যা শিখে এবং মুখস্থ করে সেগুলো তার স্মৃতিতে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে। সেই বয়সে কুরআন হিফয করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে অন্যান্য বিষয়গুলো মুখস্থ করা সহজ হয়। যে শিশুরা নিয়মিতভাবে কুরআন হিফয করে তারা পরবর্তীকালে অন্যান্য বিষয়েও ভালো ফলাফল করে। বালক আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীস মুখস্থ করতেই উৎকর্ষতা অর্জন করেননি, বরং তিনি সকল বিষয়ে একজন আলিম ছিলেন। তার উদাহরণ থেকে পিতা-মাতাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সন্তানের শৈশবের সময়কে আমাদের কাজে লাগানো উচিত।

শিশুকে অল্প বয়স থেকে শিক্ষা-প্রদান করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শৈশবে যখন শিশুর বিকাশ ঘটতে থাকে তখনই প্যারেন্টিং-এর প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হয়। অনেক শিশুরা ৮-৯ বছর বয়সেই বালগ হয় এবং দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা শুরু হয়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই শিশুকে প্রস্তুত করে দিতে হবে, যেন সে একজন দায়িত্বশীল মুসলিম হিসেবে নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং স্বাধীন-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বালগ হয়ে গেলে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করা শুরু হবে। কাজেই তার আচার-আচরণ যেন ইসলামি শারীআর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ফেরেশতারা তাদের আমলনামায় ভালো-মন্দ লিখতে থাকবেন, সেগুলো বিচার-দিবসে উপস্থাপন করা হবে। এ কারণে পিতা-মাতাকে সবকিছু আগে থেকেই শুরু করতে হবে এবং সন্তানকে সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের আগেই প্রস্তুত করে দিতে হবে।

প্যারেন্টিং এমন এক দায়িত্ব যা কখনও শেষ হয় না। কিন্তু শৈশবের দিনগুলোতেই প্যারেন্টিং-এর সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হয়। যদি সেই সময়ে সঠিকভাবে কাজ করা হয়, তা হলে পরবর্তী কাজ সহজ হয়ে যায়।

শিশু যেন সবকিছু ইসলামের চোখে দেখতে শেখে

মজবুত ঈমান এবং ইসলামি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সবকিছুকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন। কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল এটা নির্ণয় করেন ইসলামের মানদণ্ডের ভিত্তিতে। কুরআনের একটি নাম হচ্ছে ফুরকান—সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী। ফলে কুরআন মুসলিমদের প্রধান জ্ঞানের উৎস। জীবনের সকল দিকে কুরআনের দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

শিশুদেরকে বোঝাতে হবে যেন তারা সকল বিষয় এবং পরিস্থিতিতে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মোতাবেক ইসলামের লেন্স দিয়ে দেখে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এখানে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামকে

প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, হয়তো আপনার সম্ভান স্কুলে একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো; ধরুন, সে অন্য বাচ্চাদের মাধ্যমে উদ্ভুক্ত হলো, এই অবস্থায় তাকে উৎসাহিত করতে হবে যেন সে নিজের সমস্যার সমাধান কুরআন এবং হাদীস থেকে বের করার চেষ্টা করে। যারা অন্যের ক্ষতি করে তাদের ব্যাপারে কুরআনে কেমন আচরণ করতে বলা হয়েছে, নবিজি (ﷺ) এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করেছেন কিংবা নবিজির জীবনে এমন কোনো ঘটনা আছে কি যার মাধ্যমে শিশু নিজের ঘটনার মিল খুঁজে বের করতে পারে? এভাবে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে তারা শুধুমাত্র জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামি পদ্ধতি শিখবে না, বরং কুরআন-হাদীসের গভীর বুঝ অর্জন করতে থাকবে।

শিশুকে আনুগত্যের গুরুত্ব শেখাতে হবে

আনুগত্য ও মান্য করার বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কথা এসেছে। আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٨﴾

‘বলুন, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।’

(সূরা নূর, ২৪ : ৫৪)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

‘তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো। শোনো, আনুগত্য করো এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকবে, সে-ই সফলতা লাভ করবে।’ (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৬)

মুসলিম হিসেবে আমরা জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হলো সত্যিকারের মুক্তির পথ। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের সফরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম বাদে অন্য কোনো পথ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে ‘আনুগত্য’ করতে হয়। এ বিষয়ে একটু আগেই উল্লেখিত হয়েছে, ‘যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।’ মানুষ হিসেবে যদি আমরা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যে নিজেকে সঁপে না দিই

তা হলে আমরা নিজেদের কামনা-বাসনার গোলামে পরিণত হবো। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্যান্য সকল গোলামি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এতেই মানবাত্মার উৎকর্ষ অর্জিত হয়। এটি একটি কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব।

যারা আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করে তাদের পুরস্কারের বিশালতা থেকে আমরা আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝতে পারি। আল্লাহ বলেছেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

‘এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে-কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১৩)

কত চমৎকার বিনিময়! কত চমৎকার ঠিকানা! জান্নাত এবং জান্নাতের উদ্যানসমূহ! আল্লাহ আরও বলেছেন,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿١٤﴾

‘এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে বরণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৬৯)

আমাদের আর কী চাওয়ার থাকতে পারে! এ-যে আল্লাহর ওয়াদা!

পরিবারের মধ্যে আনুগত্যের চর্চা

আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে জান্নাতের মতো একটি পরিবেশ এই দুনিয়াতেও সৃষ্টি করা যায়! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জান্নাত এবং দুনিয়া কখনও একই রকম হবে না, কিন্তু কিছু মিল তো থাকতেই পারে! বিশেষ করে মুমিনদের প্রতি আল্লাহ যে প্রশান্তি ও আনন্দ-প্রদানের ওয়াদা করেছেন সেটা আমরা অর্জন করতে পারি। আল্লাহ জানেন আমাদের জন্য কোন বিষয়টি সর্বোত্তম। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যদি ঐক্য এবং সম্প্রীতির সমন্বয় থাকে তা হলে সেখানে ভালোবাসা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটে। তবে এ বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এভাবে একটি পরিবার

সর্বোচ্চ কার্যকরী থাকে। মনে রাখুন! এই সূত্রের প্রধান অংশ হলো আনুগত্য!

পরিবারকে কার্যকরী রাখার জন্য স্ত্রীকে যেমন স্বামীর আনুগত্য করতে হবে, তেমনি সন্তানদেরকেও পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। এভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা হবে এবং আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার অর্জিত হবে। আল্লাহ বলেছেন,

‘...সতী-সান্থী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন, তা রক্ষা করে থাকে...।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে মা সন্তানের সামনে একটি উত্তম রোল মডেল উপস্থাপন করে। ফলে সন্তান মাকে অনুকরণ করে আনুগত্যের এই গুণ অর্জন করতে পারে।

শিশুকে শৈশব থেকেই এই বিষয়টি শেখাতে হবে এবং বাবা-মায়ের পারস্পরিক আচরণের নমুনা দেখে শিশু শিখতে পারবে। পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের একটি প্রশিক্ষণ। এই দুটি বিষয় অনেক ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কার্যকরী প্যারেন্টিং-এর মাধ্যমে শিশু বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। ফলে শিশুর মন দায়িত্বশীলতা গ্রহণের জন্য তৈরি হয়। শিশুকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যে পিতা-মাতার আনুগত্যের মাধ্যমে সে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করছে।

পরিবারে আনুগত্যের প্রশিক্ষণ লাভ করার সুফল শিশুর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। স্কুলে, বন্ধু-বান্ধব ও খেলার সাথীদের সাথে এবং বড়দের সাথে চলতে ফিরতে অনেক পরিস্থিতিতে তাকে অন্যের কথা শুনতে ও মানতে হবে। ছাত্র হলে শিক্ষকের কথা মানতে হবে, কর্মী হলে সুপারভাইজারের কথা মানতে হবে, সৈনিক হলে কমান্ডারের আদেশ মানতে হবে ইত্যাদি। সর্বোপরি, চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাকে আল্লাহকে মানতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

‘হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তা হলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো। এটিই সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯)

একটি কার্যকরী সমাজের জন্য আনুগত্যের ক্রমধারা রক্ষার এই নীতিটি অত্যন্ত জরুরি।

এর পেছনে একটি হিকমাহ রয়েছে। সেটা হলো পিতা-মাতা ও বড়রা শিশুদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণতার অধিকারী। তারা জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নিজেদের ভুল থেকেও তারা অনেক কিছু শিখেছেন। ফলে শিশুকে আমরা বুঝিয়ে বলব, ‘তোমার কল্যাণের কথা

মাথায় রেখেই বড়রা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে শিশু বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবে এবং তাদের উপর ভরসা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের স্বভাবপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের চেয়েও ভালো জানেন, তিনিই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা এবং বিচারক।

শিশুমনে নৈতিকতার বিকাশ ও প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি

বর্তমান যুগে শিশুরা বিভিন্ন অর্থহীন কাজে অনেক সময় নষ্ট করে। যেমন : টিভি দেখা, কম্পিউটার গেইম, মোবাইল গেইম, ইন্টারনেটে ব্রাউজিং ইত্যাদি। এই তালিকার শেষ নেই। সারকথা, তারা বাস্তব জগতে যতটুকু সময় কাটায় তারচেয়ে অনেক বেশি সময় কাটায় কাল্পনিক ‘ভার্চুয়াল’ জগতে। যদি আপনি এই বিষয়ের বাস্তবতা এবং প্রভাব নিয়ে চিন্তা করেন তা হলে শিউরে উঠবেন! মুসলিম সম্ভানের পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের উচিত অর্থপূর্ণ কর্মসূচি এবং মূল্যবোধের উপর ফোকাস করা এবং শিশুর মনেও একই আকাংক্ষা সৃষ্টি করা।

বর্তমান দুনিয়ার দিকে তাকালে আমরা চতুর্দিকে যুলুম-অত্যাচার, ধ্বংস, হানাহানি, মানবাধিকারের লঙ্ঘন ইত্যাদি দেখতে পাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবের ভিকটিম হচ্ছে মুসলিমরা! আমাদের স্মরণ রাখা উচিত বর্তমানে আমাদের ভাই-বোনেরা যে-সকল দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা আমাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। আমাদের অসহায় মুসলিম ভাইবোনেরা মরিয়া হয়ে সাহায্যের আবেদন করে যাচ্ছেন। তাদের ডাকে অবশ্যই আমাদের সাড়া দিতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে অসহায় শিশুদের সাহায্য করতে হবে, যাদের সামনে একটি অন্ধকার ভবিষ্যৎ এবং হতাশা অপেক্ষা করছে। তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বড়দের উপর মুখাপেক্ষী।

তাদের প্রতি সহমর্মিতা, দয়া ও করুণা অনুভব করা আমাদের ন্যূনতম করণীয়! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-মায়্যা ও স্নেহ-মমতার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও তা অনুভূত হয়—সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়)।’^[১০২]

তারা যেন তাদের দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন এজন্য প্রতিদিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দুআ করতে হবে। এরপর সাধ্যমতো সর্বোচ্চ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

‘তোমাদের কেউ যদি কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত

দিয়ে (শক্তি দ্বারা) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এতে সমর্থ্য না হয় তবে যেন মুখের (কথার) সাহায্যে তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এই শক্তিটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের সাহায্যে তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।^[১০৩]

শিশুদেরকে উত্তম মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা

পিতা-মাতা হিসেবে সমাজের প্রতি আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। সন্তানদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করা তেমনি একটি দায়িত্ব। দানশীলতা, কল্যাণকামিতা, সহমর্মিতা, শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শিশুদেরকে শেখাতে হবে। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই অন্যের প্রতি সহমর্মিতা শিশুদের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। শিশুরা সহজাতভাবেই অন্যের প্রয়োজন পূরণ করতে চায়, সাহায্য করতে চায়। এ-সকল উত্তম মানবিক গুণ বিকাশের লক্ষ্যে শুরুর দিকেই শিশুদেরকে সারা বিশ্বের অসহায় মুসলিম ও অন্যান্য নির্যাতিত মানুষদের ব্যাপারে জানাতে হবে। দুনিয়াতে যে-সকল অন্যায়-অবিচার, জুলুম-অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অনাচার রয়েছে এগুলো তাদেরকে জানাতে হবে। দুনিয়াটা ফুলশয্যা নয়, এর কঠিন বাস্তবতা তাদেরকে বোঝাতে হবে। তারা ভয় পাবে, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে সত্য লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, অন্যান্য স্থানে মুসলিমরা যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে এবং নিদারুণ অসহায় অবস্থা অতিক্রম করছে, আল্লাহর রহমতের কারণেই আমরা হয়তো সেই অবস্থার মধ্যে নেই।

তাদেরকে সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষাপ্রদান করতে হবে। ইসলামে পরোপকারিতা, দান-সদাকার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে হবে। নবীজি (ﷺ) বলেছেন,

‘মানুষের জন্য আবশ্যিক হলো দেহের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সদাকা করা। সূর্য যে দিনই ওঠে (যে-কোনো দিনই) তুমি দু-ব্যক্তির মাঝে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করে দিবে—একটি সদাকা; কাউকে তার বাহনে উঠতে সহায়তা করবে, এটি একটি সদাকা। অথবা বাহনে কারও আসবাবপত্র তুলে দিবে, এটিও একটি সদাকা। উত্তম কথাও একটি সদাকা। সালাত অভিমুখে প্রতি কদম ফেলবে, এটিও এক একটি সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেবে, তাও সাদকাহ।’^[১০৪]

তিনি আরও বলেছেন,

‘প্রত্যেক মুসলিমের সদাকা করা উচিত। সাহাবিরা আরজ করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ যদি সদাকা দেওয়ার মতো কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে)

[১০৩] ইবনু মাজাহ: ৩২৫৮; তিরমিযি: ২১৭২।

[১০৪] বুখারি: ২৮৯১; মুসলিম: ১০০৯।

বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে, এতে নিজেও লাভবান হবে, সদাকাও করতে পারবে। তারা বললেন, 'যদি এরও সামর্থ্য না থাকে?' তিনি বললেন, 'কোনো বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে।' তারা বললেন, 'যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে?' তিনি বললেন, 'এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সদাকা বলে গণ্য হবে।' [১০০]

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মধ্যেই সদাকা সীমাবদ্ধ নয়, বরং অপর মানুষের প্রতি যে-কোনো উত্তম আমল সদাকার অন্তর্ভুক্ত। ছিনের এই মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শিশুদের শেখাতে হবে যেন ছোট বয়স থেকেই তাদের জীবনে এটি অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মুসলিমদেরকে দৈনিক ও নিয়মিত বিভিন্ন পরোপকারের আমল করতে হবে। শিশুরা নিজেরাও অর্থ সংগ্রহ করে দান করতে পারে। নিজেদের পোশাক এবং খেলনাগুলো দরিদ্র শিশুদেরকে দান করতে পারে। বিভিন্ন তহবিল সংগ্রহের কাজে তারা অংশ নিতে পারে এবং মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অন্যান্যদের সচেতন করতে পারে। বিশ্বব্যাপী নানা অবিচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে লেখালেখি, চিঠি ও অন্যান্য প্রচারণায় অংশ নিতে পারে। এ ধরনের অনেক কাজের সুযোগ রয়েছে। এভাবে শিশু মুসলিম হওয়ার সত্যিকার অর্থ বুঝতে পারবে। মুসলিমরা কীভাবে উম্মাহর প্রতি দায়বদ্ধ সেই অনুভূতি তৈরি হবে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে তার ঈমান এবং ইসলামি ব্যক্তিত্ব দারুনভাবে শক্তিশালী হবে। অর্থপূর্ণ কার্যক্রম ও প্রচেষ্টাতে তার সময় ব্যয় হবে। আর এটি দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য বিরাট পুরস্কার ও কল্যাণ বয়ে আনবে।

এভাবে সময়ের সাথে সাথে অপরের প্রতি সদয় হওয়া ও কল্যাণকামিতা শিশুর ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যাবে। সে নিজের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামাত আবিষ্কার করবে এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি শুকরিয়া আদায় করবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সকল নিয়ামাতের (শক্তি-সামর্থ্য, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য) সঠিক ব্যবহার করবে এবং দরিদ্র অসহায়দের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। কখনও কোনো নেক কাজের সুযোগ হাতছাড়া করবে না, কারণ সে অনুভব করবে যত ভালো আমল সে করুক না কেন আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামাতের বিপরীতে এগুলো কিছুই নয়। একজন পিতা-মাতা নিজের সন্তানের কাছ থেকে এর বেশি আর কী চাইতে পারে!

টিনেজার বা উঠতি বয়সের শিশু-কিশোররা চিন্তাশীল হয় এবং তাদের ভেতরে পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার একটি তাড়না কাজ করে। তারা বিশ্বকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখে। এ-সকল সহজাত বৈশিষ্ট্যকে পিতা-মাতার উৎসাহিত করা উচিত এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করা উচিত। করার মতো অনেক কাজ রয়েছে যার শেষ নেই। কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। কৈশোরে যারা নানাবিধ স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম ও

সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ করছে, নিঃসন্দেহে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারা সেগুলো আরও বড় আকারে অব্যাহত রাখতে চাইবে। ফলে তাদের মাধ্যমে মুসলিম-সমাজ শক্তিশালী হবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

শিশুর জন্য পিতা-মাতাকেই উত্তম আদর্শ হতে হবে

শুরু থেকেই পিতা-মাতাকে লক্ষ রাখতে হবে তাদের ব্যক্তিত্ব, কথা এবং কাজ যেন একজন সত্যিকার মুসলিমের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে। শিশুরা যাদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করে ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখে তাদের ব্যক্তিত্ব থেকে বিভিন্ন মূল্যবোধ ও চেতনা নিজের ব্যক্তিত্বে ধারণ করে নেয়। এক্ষেত্রে পিতা-মাতাকেই প্রধান ভূমিকায় আবির্ভূত হতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। ছোটরা সাধারণত কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধের দিকে আকর্ষিত হয়। সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি হতে পারে পিতা-মাতার উভয়ে অথবা যে-কোনো একজন, কিংবা প্রিয় শিক্ষক, বড় ভাই বা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি—যার আচার-আচরণ ও চিন্তাধারা শিশুর কাছে প্রশংসাযোগ্য মনে হয়।

ছোটদের সামনে বড়রা এমন কাজ করবে যা প্রশংসনীয়। সফল রোল মডেল, পরামর্শদাতা এবং গাইড হিসেবে নিজেদেরকে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখবেন, শিশুরা যাদেরকে ভালোবাসে তাদের কাছ থেকে মূল্যবোধ, আচার-আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি শেখে। এরপর এগুলো তাদের ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতির সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, নিঃসন্দেহে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রোল মডেল হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ(ﷺ)। তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে সংরক্ষিত রয়েছে। আচার-আচরণে ও আদর্শে তাকে অনুকরণের মাধ্যমে সেগুলোতে প্রাণ-সঞ্চার করতে হবে। আমরা নিজেরা যা পালন করি না, সেটা শিশুদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা অনুচিত। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তারা আমাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হবে এই সুযোগ তো সবার সামনেই খোলা রয়েছে! প্রয়োজন শুধু এর সদ্যবহার করা।

মুসলিম হওয়া গর্ব ও সম্মানের বিষয়

মুসলিম হয়ে দীন ইসলাম পালনের কারণে আমরা ধন্য, সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়েছি। এ বিষয়গুলো শিশুকে বুঝতে দিন। এক্ষেত্রেও পিতা-মাতাকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুদের অনুভূতিশক্তি খুব তীব্র! তারা সহজেই পিতা-মাতার প্রকৃত অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা ধরে ফেলে, যদিও সেগুলো আচরণে গোপন করার চেষ্টা হোক না কেন!

গর্ব আর অহংকার এক বিষয় নয়। গর্ব অনুভব করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আত্মমর্যাদা, অভিজাত্য, সম্মান এবং দৃঢ়তা অনুভব করে। যে মুসলিমের ইতিবাচক

আত্মপরিচয় রয়েছে, সে আল্লাহর জন্য ইসলামের পতাকা-বাহক হয়ে যায়। ইসলাম হলো আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার। এই উপহার লাভ করে মুসলিমদের গর্বিত ও ধন্য হওয়া উচিত। তারা যেখানেই থাকুক না ইসলামের জন্য কাজ করা উচিত।

আত্মপরিচয় (আইডেনটিটি) গঠনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো আত্মমর্যাদা (self-respect), আত্মসম্মান (self-esteem) এবং গর্ব (pride)। একজন ব্যক্তিকে দৃঢ় ও স্থিতিশীল মানসিক অবস্থা প্রদানের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজে নিজের অবস্থানকে মূল্যায়ন করে এবং আত্মপরিচয় গঠন করে। মুসলিম-পরিচয়ের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি আত্মসম্মান অনুভব না করে, তবে সে অন্য পরিচয় ধারণের মাধ্যমে আত্মসম্মান অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে। শিশু-কিশোররা এ প্রভাবকগুলোর ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল! কেননা, সেই বয়সে ধীরে ধীরে তাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে থাকে। সুতরাং, সন্তানদের অন্তরে ইতিবাচক ও বিজয়ী মানসিকতা সৃষ্টি করা পিতা-মাতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

জিহাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি

জিহাদ দ্বীন ইসলামের প্রধান বুনিয়াদি বিষয়সমূহের একটি। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী এই বিষয়টিকে পরিত্যাগ করেছে। বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা লাঞ্ছিত হওয়ার এটি অন্যতম কারণ। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। মুসলিম হিসেবে আমরা জানি, সকল সমস্যার টেকসই ও কার্যকরী সমাধান রয়েছে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে। জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ন্যায্যবিচার, নিরাপত্তা এবং সম্মানের গ্যারান্টি লাভ করা যায়। আল্লাহর পথে সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দ্বীন কায়েম ও শারীআ প্রতিষ্ঠা করা। একমাত্র এর মাধ্যমেই সকল জুলুম পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয় এবং ততটা ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করা যায়, যার তিনি যোগ্য দাবিদার।

এটি এমন একটি পদ্ধতি, যা একদিনে অর্জন করা যায় না। এর জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ইসলামি পরিভাষায় সেই সংগ্রামের নাম হলো জিহাদ। জিহাদ একটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ সংগ্রাম, সাধনা, প্রচেষ্টা করা, উন্নতি ঘটানো।

শাব্দিক অর্থে যদিও এটি একজন ব্যক্তির সকল প্রচেষ্টাকে বোঝায় কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় জিহাদের সাধারণ অর্থ হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা। এর লক্ষ্য হলো দ্বীন ইসলামকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের অন্তর, আমাদের ঘরবাড়ি, সমাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾

‘যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।’ (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৬৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

‘তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠা’ (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৯ : ১৫)

জিহাদের অর্থ সকল প্রকার অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি, অত্যাচার, লুটপাট এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এর অর্থ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও কিতাবের অবমাননার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এর অর্থ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপনে লড়াই করা। কেননা, শয়তান তার বাহিনী-সহকারে কার্যক্রমে নিয়োজিত। আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

‘যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। কাজেই শয়তানের সহযোগীদের সাথে লড়াই এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, শয়তানের কৌশল নিতান্তই দুর্বল।’ (সূরা নিসা, ৪ : ৭৬)

শয়তান ও তার সঙ্গীসাথি, অনুচর ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হলো চূড়ান্ত জিহাদ। জিন ও মানুষ উভয়ের মধ্যেই শয়তানের অনুসারী ও সঙ্গীসাথি রয়েছে। জিহাদ দ্বীন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর গুরুত্ব বোঝার জন্য সেই অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা উচিত যে, জিহাদ পরিত্যাগ করলে কীভাবে মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জিহাদ না থাকলে অন্যায়ের রাজত্ব কায়ম হয়। জিহাদ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা এতে অংশগ্রহণ করে তারা সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। আবু সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন,

‘একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, ওই মুমিন, যে তার মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে...’ [১০৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিহাদকে দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম বলেছেন। তিনি বলেছেন,

‘আল্লাহর পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া

ও তার মধ্যে যা-কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম।^[১০৭]

এই হাদীসের গভীরতা বুঝতে হলে ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, আল্লাহর ভয় এবং ইসলামের আধ্যাত্মিকতা বুঝতে হবে।

দ্বীনের মৌলিক ফরয আমল যেমন, পিতা মাতার প্রতি সদয় হওয়া এবং সালাত আদায় করার সাথে জিহাদকে যুক্ত করা হয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি (সাহাবি) নবি (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করা, মাতাপিতার সাথে সদ্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।^[১০৮]

অন্য হাদীসে, জিহাদের মর্যাদাকে অন্যান্য সকল আমলের উর্ধ্ব স্থান দেওয়া হয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! জিহাদের সমতুল্য কি কোনো আমল হতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। লোকটি দুই বা তিনবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারেই তিনি বললেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, 'তুমি কি এমনটি করতে পারবে, যখন মুজাহিদ (জিহাদের জন্য) বের হবে তখন থেকে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত পানাহার (ইফতার) না করে কোনো বিরতি ছাড়াই রোযা রাখতে থাকবে; অবিরাম সালাত পড়তে থাকবে, কখনও বিরত হবে না, তুমি কি এমনটা করতে পারবে? লোকটি বলল, না। রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন, এটাই হলো জিহাদের সমতুল্য আমল।^[১০৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও জিহাদ ভালোবাসতেন এবং শাহাদাতের তামান্না করতেন।

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন,

'আর যে সত্তার হাতের মুঠোয় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর কসম! যে আল্লাহর পথে কোনো আঘাত পাবে, সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে এমনভাবে হাজির হবে যেমন আঘাত পাবার দিন তার শরীরের অবস্থা ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ, তার গন্ধ হবে মিশকের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! মুসলমানদের উপর যদি এটা কঠিন না হতো, তবে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত তার থেকে আমি কখনও পেছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা স্বচ্ছল হতে পেরেছি যে, এর ফলে আমি সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারি, আর না মুসলমানদের এতটা স্বচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পিছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাব। আর সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে, আমি

[১০৭] মুসলিম : ১৮৮০।

[১০৮] বুখারি : ৭৫৩৪।

[১০৯] মুসলিম : ১৮৭৮।

আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যাব, তারপর আবার লড়াই করে শহীদ হয়ে যাব, তারপর আবার লড়াই করে শহীদ হয়ে যাব।^[১১০]

সম্মান ও মর্যাদায় জিহাদের সমতুল্য আমল এই দ্বীনে অল্পই রয়েছে। এটি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য লড়াই করা হয়। প্রকৃত অর্থে, এই লড়াই মানুষের নিজেদের স্বার্থেই। কারণ এর মাধ্যমে সে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে, অন্তরে পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারে এবং চূড়ান্ত ফল হিসেবে আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামদের অনেকে তাদের নাবালক সন্তানদেরকেও যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতেন যেন তারা বীরত্ব, সাহসিকতা শিখতে পারে এবং তাদের মনে জিহাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জিহাদের গুরুত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে শিশুদের প্রতি আমরা এই বার্তাগুলো পৌঁছে দিতে পারি।

শিশুদেরকে ইসলামের বীরযোদ্ধা, জিহাদ ও বিজয়ের গল্প বলুন

শিশুদেরকে ইসলামের বীরযোদ্ধা, জিহাদ ও বিজয়ের গল্প বলুন। শিশুরা বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রতি উৎসাহিত হবে যদি তাদেরকে আমরা আমাদের মুসলিম বীরদের গল্প ও বিজয়ের ঘটনাগুলো শোনাই। শিশুর মনে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা গড়ে তোমার লক্ষ্যে এটি একটি উত্তম পন্থা। এর মাধ্যমে অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সকল প্রকারের জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। শিশুরা ‘রোল মডেল’ দেখতে আগ্রহী। তারা বীরত্বের ঘটনা ও সাহসিকতার গল্প শুনতে ভালোবাসে। বিশেষত ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কাল্পনিক হিরোদের বদলে তাদের সামনে বীর হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সালাফদের—যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন। কুফরের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর গল্প আমরা তাদেরকে শোনাব। তাদের সামনে সেই ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে হবে যেখানে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। পরবর্তী ইতিহাস থেকে বিভিন্ন মুসলিম বাহিনীর আমির ও যুদ্ধের ঘটনা তাদেরকে বলতে হবে। আরও বলতে হবে কিংবদন্তি মুসলিম আলিমদের কথা, যারা জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের সাথে তাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে। ইতিহাস জুড়ে যে-সকল যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জন করেছে সেসব ঘটনা যেন তাদের জানা থাকে।

নৃতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের পূর্বে ইসলাম

মুসলিম-পরিচয় বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান হুমকি হলো জাতীয়তাবাদ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٥﴾

‘তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলব। আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থেকে থাকে এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে, তা হলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে?’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭০)

এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অতীতে মুসলিমরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বর্তমানেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক মুসলিমদেরকে দেখা যায় তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, দেশীয় ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদকে ইসলামি মূল্যবোধ, আচার অনুষ্ঠানের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন। এর অর্থ ইসলামি পরিচিতি অপেক্ষা তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি অধিক শক্তিশালী। এই ব্যাধির একটি নিদর্শন হলো মাসজিদগুলো নৃতাত্ত্বিক বা জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে বিভক্ত (লেখিকা অমুসলিম সংখ্যা-প্রধান পশ্চিমা দেশে নির্মিত মাসজিদগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন; ব্রিটিশ মাসজিদ, পাকিস্তানি মাসজিদ, ভারতীয় মাসজিদ, আফ্রিকান মাসজিদ, তুর্কী মাসজিদ ইত্যাদি) এবং এই দুটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও আতঙ্কের বিষয় হলো অনেকে (জাতীয়বাদ ও গোত্রবাদের কারণে) কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা পর্যন্ত উপেক্ষা করে। কেননা, তাদের পরিবার, পূর্বপুরুষরা এতদিন ধরে যা করে এসেছে সে ঐতিহ্য তারা পরিবর্তন করতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে ইসলামকে মিশিয়ে ফেলা হয়। সেগুলোকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়।

শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে নিজেদের মুসলিম পরিচয় এবং ইসলামের স্থান সবকিছুর উপরে। আমাদের পরিচয়, আমরা প্রথমে মুসলিম এরপরে অন্য যা-কিছু ইসলামের সঙ্গে যতটুকু সংগতিপূর্ণ ততটুকু। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মুসলিমরা পরস্পরের ভাই ও বোন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভেদে কেউ কারও থেকে উত্তম বা অধম নয়। মুসলিম হওয়ার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নেই। এই বিষয়টি শিশুদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। যদি জাতীয়তাবাদ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে ইসলামের উর্ধ্বে স্থাপন করা হয় তা হলে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা থাকে। ওই দুইটি বিষয় নানাভাবে মানুষকে পথভ্রষ্টতা এবং শিরকের দিকে পরিচালিত করে।

যে মুসলিমরা পশ্চিমা (অমুসলিম সংখ্যাপ্রধান) ভূমিতে বসবাস করছেন তাদের ক্ষেত্রে একটি বড় হুমকি হলো ওই সকল দেশের প্রভাবশালী কালচার। যদিও ইসলাম মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথা, ভাষার বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে এবং স্বীকৃতি প্রদান করে, কিন্তু এসব যখন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন অবশ্যই ইসলাম প্রাধান্য পাবে।

শিশুমনে ইসলামি ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি

যে অন্যের প্রতি দয়া-প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-প্রদর্শন করবেন না।^[১১১]

শিশুমনে ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি বিকাশের পাশাপাশি শক্তিশালী আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বিকাশের কিছু অতিরিক্ত উপায় রয়েছে। এ বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে মূলত শিশুর আত্মমর্যাদাবোধ বিকাশের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সংজ্ঞা : আত্ম-সচেতনতা (self-concept) ও আত্মমর্যাদা

আত্ম-সচেতনতা হলো ব্যক্তির নিজের ব্যাপারে একটি মানসিক চিত্র। এটি সেসব পরিভাষার সমন্বয়ে গঠিত যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের কাছে বর্ণনা করে। যেমন সে বলে, আমি ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি, আমি লাজুক, আমি অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী, আমি কৌতুহলী, সাহসী, বুদ্ধিমান ইত্যাদি।

আত্মমর্যাদা (সেলফ এস্টিম) হলো আত্ম-সচেতনতা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য থেকে ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করে। আত্মমর্যাদাকে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও আত্মতুষ্টির পরিমাপক ধরা হয়। যে ব্যক্তির মধ্যে আত্মমর্যাদা রয়েছে সে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী অনুভব করে এবং নিজের উপর সন্তুষ্ট থাকে।

আত্মমর্যাদার গুরুত্ব

গবেষণায় দেখা গেছে যে-সকল শিশুরা নৈতিক ও ধর্ম সচেতন তাদের মধ্যে আত্ম-মূল্যায়নের চেতনার বিকাশ ঘটে। পিতা-মাতা সন্তানের ইসলামি ব্যক্তিত্ব এবং উচ্চ আত্মমর্যাদাবোধের বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে পারেন। সামাজিক এবং ‘মানসিক’

[১১১] সম্পূর্ণ হাদীসটি অত্র অধ্যায়ে সামনে উল্লেখিত আছে।

পরিবর্তনে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আত্মমর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শিশুরা অন্যদের তুলনায় উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক যোগ্যতা রাখে। তারা নিজেদের অর্জনে গর্বিত হয় এবং দায়িত্ব নিতে আগ্রহী থাকে। পরনির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তারা কঠিন পরিস্থিতিতে সহজে মানিয়ে নিতে পারে, বাধা-বিপত্তি দেখে ঘাবড়ে যায় না, বরং সেগুলোকে উৎসাহের সাথে মোকাবিলা করে। আত্মমর্যাদাবোধের মাধ্যমে শিশুরা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক উভয় ধরনের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে এবং তারা অধিক সামাজিক দক্ষতা সম্পন্ন হয়।

আত্মমর্যাদাবোধ তৈরির কিছু উপায়

আল্লাহ-প্রদত্ত উপহারগুলোর পরিচর্যা করুন

প্রতিটি শিশু কিছু নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচি, মেজাজ, দক্ষতা, সামর্থ্য ও আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ দক্ষতা থাকে। আল্লাহ এই যোগ্যতাগুলো প্রত্যেক শিশুকে কিছু উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রদান করেন। শিশুদের পরিচর্যা করতে হবে যেন তাদের সেই গুণগুলোর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। শিশুকে শেখাতে হবে যেন তাদের মেধা ও সক্ষমতাকে তারা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে নিয়োজিত করে। এভাবে শিশুরা নিজেদের জীবনের একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য খুঁজে পাবে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে পিতা-মাতাকে নিজ শিশুর মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করতে হবে। এরপর কীভাবে সেটার বিকাশ ঘটানো যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। যদি শিশুর স্বাভাবিক দক্ষতাগুলোর বিকাশ ঘটতে না দেওয়া হয়, তা হলে তার আত্মমর্যাদায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

আপনার শিশুকে ভালোবাসুন

পিতা-মাতার উচিত শিশুদেরকে বুঝতে দেওয়া যে, তারা তাদের কত ভালোবাসেন এবং কত যত্ন নেন! প্রতিনিয়ত পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে জানানো যে আমরা তোমাদেরকে ভালোবাসি। শিশুদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে সম্মান ও সৌজন্যবোধ বজায় রেখে আচরণ করতে হবে। কেননা, মুখের কথার থেকে কাজ অনেক বেশি শক্তিশালী। শিশুকে স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া, কোলে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা, মাথায় হাত বুলানো কিংবা উৎসাহ দিয়ে পিঠে চাপড়ে দেওয়া ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পিতা-মাতাকে অবশ্যই যথাসম্ভব নিজের সন্তানের সাথে সময় কাটাতে হবে। একত্রে খেলাধুলা করা, কথা বলা, গল্প করা, বাইরে হাঁটতে যাওয়া, ঘুরাফেরা করা, একত্রে সালাত আদায় করা, মাসজিদে যাওয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা কিংবা মজার ঘটনা শেয়ার করা ইত্যাদি আনন্দদায়ক কাজ করতে হবে। শিশুর সাথে হাসি ঠাটা করা, মজা করা ইত্যাদির মাধ্যমে

নিতা-মাতার সাথে শিশুর একটি মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে—যার মাধ্যমে পরবর্তী জীবনের অনেক কঠিন পরিস্থিতি সহজে এড়ানো যায়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উদাহরণ হতে আমরা দেখতে পাই, তিনি সব সময় শিশুদের প্রতি সদয়, কোমল, শ্রদ্ধাশীল এবং মমতাময় ছিলেন। তিনি শিশুদেরকে অনেক ভালোবাসতেন। পথেঘাটে দেখা হলে তিনিই প্রথমে শিশুদেরকে সালাম দিতেন। তাদের সাথে খেলা করতেন, মজা করতেন। নিজের নাতি হাসান এবং হুসাইনকে পিঠের উপর চড়াতেন। তাদেরকে কোলে তুলে নিতেন, চুমু খেতেন। ইয়ালা ইবনু মুররা উল্লেখ করেছেন,

‘তারা নবিজি (ﷺ)-এর সাথে এক দাওয়াতে রওনা হন। তখন হুসাইন গলির মধ্যে খেলাধুলা করছিলেন। রাবি বলেন, নবিজি (ﷺ) লোকেদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত বিস্তার করে দিলেন। বাচ্চারা এদিক ওদিক দৌড়ে পালাতে থাকল এবং নবিজি (ﷺ) তাকে হাসতে হাসতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত হুসাইনের চোয়ালের নিচে এবং অপর হাত মাথার তালুতে রাখলেন, এরপর তাকে চুমু দিলেন।’^[১১২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিশুদেরকে আদর করতেন। উসামা ইবনু যায়েদ বলেছেন, ‘একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর এক উরুর উপরে বসালেন এবং হাসান ইবনু আলিকে আরেক উরুর উপর বসালেন। এরপর আমাদের জড়িয়ে ধরে দুআ করে বললেন, ‘ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের প্রতি সদয় হোন যেভাবে আমি তাদের প্রতি সদয়!’^[১১৩] ইউসুফ ইবনু আবদুস সালাম বলেছেন, ‘আল্লাহর নবি আমার নাম রেখেছেন ইউসুফ, আমাকে তার হাঁটুর উপরে বসিয়েছেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ছিলেন।’^[১১৪]

আরেকটি সুপরিচিত হাদীসে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন,

‘একদা রাসূলে আকরাম (ﷺ) হাসান ইবনু আলিকে চুমু খেলেন। তখন আকরা ইবনু হারিস তাঁর কাছেই ছিলেন। আকরা বললেন, ‘আমার দশটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে ব্যক্তি দয়া-প্রদর্শন করে না, সে দয়ার যোগ্য হতে পারে না।’^[১১৫]

আইশা রদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন,

‘একবার একদল বেদুইন নবিজির খেদমতে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা কি শিশুদেরকে চুমু খান? আল্লাহর কসম! আমরা তো

[১১২] ইবনু হিব্বান : ৬৯৭১, সহীহ।

[১১৩] বুখারি : ৬০০৩।

[১১৪] আহমাদ : ১৬৪০৭।

[১১৫] বুখারি : ৫৯৯৭; মুসলিম : ২৩১৮।

তাদেরকে চুমু দিই না।' তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত উঠিয়ে নেন, তবে আমি কী করতে পারি?'^[১১৬]

আপনার শিশুকে সঙ্গ দিন

আমেরিকাতে প্রতিটি শিশু সপ্তাহে ১৬৮০ মিনিট একটি মেশিনের সামনে বসে থাকে আর সপ্তাহে মাত্র ৩৮.৫ মিনিট নিজের বাবা মায়ের সাথে সময় কাটায়। প্রিয় পাঠক! সেই মেশিনটির নাম হচ্ছে টেলিভিশন (লেখিকা যখন বই লিখেছেন তখন টেলিভিশনের প্রভাব ব্যাপক ছিল। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে)। কিছু ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর অপর প্রান্তের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটায় কিন্তু পাশের ঘরে থাকা পিতা-মাতার জন্য কোনো সময় বরাদ্দ রাখে না। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পিতা-মাতা প্রতিদিন তার সন্তানদের জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করে রাখবেন। শুধুমাত্র সন্তানের আত্মমর্যাদা বিকাশের জন্য নয়, বরং আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সাথে জড়িত রয়েছে।

নিয়মিত যোগাযোগ ছাড়া কোনো মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা খুবই কঠিন। যোগাযোগের ভিত্তিতেই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ বিষয়টি সন্তান ও পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সত্য। যদি সন্তানের সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ না থাকে তা হলে আমাদের আশা করা উচিত নয় যে আমাদের কথার দ্বারা তারা প্রভাবিত হবে। যখন সন্তান বড় হয়ে ওঠে এবং নিজের মতো করে পৃথিবীকে বুঝতে শেখে, তখন এ কথাটি আরও বেশি সত্য। যদি পিতা-মাতার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা এবং সুসম্পর্ক থাকে তা হলে জীবনে চলার পথে যে-সকল প্রশ্ন কিংবা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবে সেগুলো নিয়ে পিতা-মাতার সাথে আলাপ আলোচনা করবে। এভাবে পিতা-মাতার সামনে একটি মূল্যবান সুযোগ উন্মুক্ত হবে, পিতা-মাতা নিজের সন্তানের সাথে তাদের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ সরাসরি আলোচনা করতে পারবে। যদি সন্তানের সাথে এই কমিউনিকেশন না থাকে তা হলে এটা কখনোই ঘটবে না। সন্তানের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে এবং তাকে শাসন করতেও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুব জরুরি।

একটি কার্যকর কমিউনিকেশনের সবচেয়ে সংবেদনশীল উপাদান হলো মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা। এর অর্থ শিশুকে নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ প্রদান করা, নিজের আবেগ অনুভূতি কিংবা মতামতকে কিছু সময়ের জন্য দূরে সরিয়ে রাখা। শিশু যা বলতে চাচ্ছে বা প্রকাশ করতে যাচ্ছে সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা। তার চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি কিংবা ধারণাকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে তাদের এই পারস্পরিক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত ক্ষেত্রে

পিতা-মাতা সঠিক মূল্যবোধ এবং আকীদা প্রকাশ করবেন, তবে সেটা করতে হবে ধীরে ধীরে এবং শাস্তভাবে। অযৌক্তিকভাবে সেটা প্রকাশ করা যাবে না। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে শিশুকে দোষারোপ না করে কিংবা কটু মন্তব্য না করে সেগুলো নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করতে হবে।

শিশুর উত্তম আচরণের প্রশংসা করুন

প্রশংসা করলে শিশুরা উৎসাহিত হয় এবং কাজে আরও মনোযোগী হয়। ইতিবাচকভাবে সাদা দেয়। এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হলো শিশুদের আচরণগত সমস্যা তৈরি হয় না, কিংবা হলেও দূর করা যায়। শিশুর ভালো কাজে প্রশংসা করলে শিশুর আত্মমর্যাদা বিকশিত হয়। যেমন : শিশুকে যদি বলা হয়, ‘তোমার কাজের জন্য ধন্যবাদ!’ ‘খুবই চমৎকার একটি কথা বলেছ!’ ‘দারুন একটি বুদ্ধি দিয়েছ!’ ‘তুমি খুবই ভালো ছেলে!’ ‘দারুন! মা শা আল্লাহ!’^[১১৭] ‘আল্লাহ তোমার উপর খুশি হবেন’ ইত্যাদি। প্রশংসা, স্বীকৃতি, কিছু বিষয়ে বাড়তি সুবিধা দেওয়া কিংবা ছোটখাটো দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে সফলতা ও অর্জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। পুরস্কার হিসেবে শিশুকে আদর করা, চুমু খাওয়া, কোলে নেওয়া ইত্যাদিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শিশুর ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য কিংবা শাসন করার ক্ষেত্রে কঠোরতা, বকাঝকা, মারধর করার থেকে প্রশংসা ও নম্রতা অধিকতর কার্যকর। বস্তুত কঠোরতা করলে শিশু নিজেকে গুটিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যখন আল্লাহ কোনো গৃহবাসীদের কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাদের মধ্যে রহমতের বিস্তার ঘটান।’ নবিজি (ﷺ) আরও বলেছেন, ‘আল্লাহ নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতার মাধ্যমে যা প্রদান করেন কঠোরতার মাধ্যমে তা প্রদান করেন না।’^[১১৮] যে পিতা-মাতা শিশুদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন এবং তাদের সাথে নম্রতা-প্রদর্শন করেন সেই সন্তানদের শাসন করা, ভুল শুধরে দেওয়া দ্রুত কার্যকর এবং সহজ। এভাবে অযথা ঝগড়া বিতর্ক এবং সংঘাত এড়ানো যায়।

প্রকাশ্যে শিশুর প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদান

সাহল ইবনু সা’দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু পানীয় পরিবেশন করা হলে তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক এবং বাম দিকে কয়েকজন বৃদ্ধ। তিনি বালকটিকে বললেন, ‘তুমি কি আমাকে বৃদ্ধদের আগে দিতে অনুমতি দেবে?’ বালকটি বলল, ‘না, আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত আমার অংশের উপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দেব না।’ তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা তার হাতে

[১১৭] মা শা আল্লাহ : ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন’ : কারও কাজের প্রতি যে প্রশংসাসূচক বক্তব্য বলা হয়।

[১১৮] মুসলিম : ২৫৯৩।

দিলেন।^[১১৯]

এ হাদীসের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি অত্যন্ত মূল্যবান এবং অনন্য সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরাই শিশুদেরকে উপেক্ষা করে অথবা তাদেরকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো অনেক পিতা-মাতা বাইরের অপরিচিত মানুষদের সাথে অনেক সৌজন্য ও সম্মান বজায় রেখে আচরণ করেন, কিন্তু নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই ধরনের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আদব রক্ষার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মনে রাখবেন, শিশুরাও মানুষ এবং তারাও বড়দের মতো সম্মানের দাবিদার। সকল অবস্থাতেই শিশুদেরকে সম্মান করা এবং তাদের প্রশংসা করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত অন্যান্য মানুষদের সামনে শিশু যখন দেখে পিতা-মাতা তার কাজের মূল্যায়ন করছে এবং প্রশংসা করছে, তখন শিশু খুবই প্রভাবিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইলমের আলোচনাতে শিশু-কিশোরদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন।

বড়দের সাথে একত্রে অংশগ্রহণ করার এই অভিজ্ঞতাগুলো অমূল্য সম্পদ। এভাবে শিশুদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটে এবং খুব সহজেই তারা শৈশব থেকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়, এবং জীবনের দায়িত্বগুলো গ্রহণ করতে শেখে।

শিশুকে অপমান করবেন না, লজ্জা দিবেন না

সন্তানদেরকে অপমান করা বা লজ্জা দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে বাইরের মানুষের সামনে এটা আরও বেশি অনুচিত। শিশুদের কোনো মতামতকে খাটো করা বা বিদ্রূপ করাও উচিত নয়। আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘আমি দশ বছর নবিজির খেদমত করেছি কিন্তু তিনি কখনও আমাকে ‘উফ’ শব্দটিও বলেননি এবং কখনও আমাকে দোষারোপ করে বলেননি, ‘তুমি কেন এই কাজটি করলে অথবা কেন কাজটি করলে না!’^[১২০] এটি শিশুদের প্রতি আচরণের আরেকটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

আনাস দীর্ঘ দশ বছর খেদমত করেছেন, এই দীর্ঘ সময়ে কখনও তাকে বকাঝকা করেননি, তার প্রতি অধৈর্য হয়ে নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করেননি। অথচ অনেক পিতা-মাতাকে দেখা যায় মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য সন্তানদের সাথে থাকলেও তারা কোনো-না-কোনো খুঁত খুঁজে বের করেন এবং তাদেরকে বকাঝকা করতে থাকেন। সবকিছুর জন্য তাদেরকে দায়ী করতে থাকেন।

এভাবে লজ্জা দেওয়া, অপমান করা এবং কটাক্ষ করার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হয়। প্রশংসা এবং নম্রতার মাধ্যমে যে ইতিবাচক ফল অর্জিত হয়, অপমান করার

মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ বিপরীত নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে শিশুর আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস হ্রাস পায়, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকৃতভাবে বেড়ে ওঠে এবং নানা আচরণগত-সমস্যা পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়। আমরা নিজেদের অবস্থান থেকেও চিন্তা করতে পারি। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি কটু মন্তব্য করে বা প্রকাশ্যে অপমান করে, লজ্জা দেয়—তখন আমরা কেমন অনুভব করি? খুবই কষ্টকর এবং বিরতকর একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শিশুরাও একই অনুভূতি অনুভব করে। আর যেহেতু সেই অবস্থায় তাদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র বিকাশমান অবস্থায় থাকে, ফলে তারা বড়দের থেকেও এসব বিষয়ের প্রতি অধিক দুর্বল ও সংবেদনশীল থাকে। এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের জীবনে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর ক্ষতিকর প্রভাব কার্যকর থাকে। সর্বদা পিতা-মাতার উচিত শিশুদের এই সেনসিটিভ এবং দুর্বল প্রকৃতি সম্পর্কে সাবধান থাকা।

শিশুদের সাথে পরামর্শ করুন এবং তাদের মতামত জানুন

বিভিন্ন বিষয়ে শিশুদের মতামত জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে শিশু নিজেকে দায়িত্বশীল, বিশ্বস্ত এবং পরিণত অনুভব করে। তারা বুঝতে পারে তাদের মতামতের মূল্য আছে। পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পরামর্শের ধরন এবং মতামত নির্ভর করে শিশুর বয়স এবং মানসিক বিকাশের উপর। যখন শিশুরা টিনেজ বয়সে পৌঁছায় তখন তাদেরকে পারিবারিক আলাপ আলোচনায় যুক্ত করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সামনের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের জন্য শিশু নিজের স্কিলগুলো বিকশিত করতে পারে। যেমন : যোগাযোগের দক্ষতা, সমস্যা সমাধান করা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আপস করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন পারিবারিক ইস্যুতে পরিবারের সবাই মিলে আলোচনা করা যেতে পারে। পারিবারিক মিটিং হলো একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা যেখানে সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভিত্তিতে পরিবারের সবাই অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে একত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, দায়িত্ব বণ্টন করা যায়, ইতিবাচক মনোভাব শেয়ার করা যায় এবং পরিবারের স্বার্থে বিভিন্ন আনন্দদায়ক কার্যক্রমের শিডিউল নির্ধারণ করা যায়। কেউ কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ-সকল আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত হয়, মিথষ্ক্রিয়া এবং সহযোগিতা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এ বিষয়টি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, কোনো পরামর্শ বা পারিবারিক আলোচনার পরেও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে পিতা-মাতার উপর। কেননা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে তারা অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত।

দায়িত্বশীলতার বিকাশ ও স্বাধীনতা প্রদান

বয়স এবং সামর্থ্য অনুসারে শিশুদের বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর বিবেক, আমানতদারিতা এবং স্বাধীন আচার-আচরণের একটি ট্রেনিং হয়ে যায়। তরুণ বয়সে তাদেরকে নিজেদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের সামনে শেখার সুযোগ আসে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা বিকাশ ঘটে। তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত যেন তাদের এই দক্ষতাগুলো তারা নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করে। যখন শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তখন তাদেরকে ক্রমান্বয়ে কিছুটা স্বাধীনতা প্রদান করতে হয়। তবে যখন প্রয়োজন হবে তখন পিতা-মাতা অবশ্যই তাদেরকে সাপোর্ট করবেন।

দায়িত্বশীলতা এবং স্বাধীনতা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস এবং উচ্চ আত্মমর্যাদাবোধের চাবিকাঠি। এ ধরনের শিশুরা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে পারে, নিজেকে প্রশংসিত ও যোগ্য অনুভব করে। এভাবে শিশু ও পিতা-মাতার পারস্পরিক বিশ্বস্ততা, ভরসা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়, আর এটি যে-কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক।

চতুর্থ পর্ব

পরিবেশের প্রভাব

শিশুর আত্মিক বিকাশে পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রভাব খুব সূক্ষ্ম কিন্তু এর গুরুত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক। বিশেষত শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হতে থাকে এবং শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে—সে সময়ে এই বিষয়টির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ বিষয় হলো শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার উপর পিতা-মাতার প্রভাব কমতে থাকে; যদিও পিতা-মাতার প্রভাব কখনও পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না কিন্তু ক্রমান্বয়ে শিশুর জীবনে সঙ্গীসাথি, বন্ধুবান্ধব এবং যাদের সাথে সে চলাফেরা করে তাদের প্রভাব অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে খুশির খবর হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তরুণ-তরুণীরা শেষ পর্যন্ত তাদের পারিবারিক শিক্ষা ও নীতি নৈতিকতাবোধ আঁকড়ে থাকে। যদিও—বা কিছু সময় তারা ‘testing the limits’ হিসেবে পার করুক না কেন! এই উৎসাহব্যাঞ্জক তথ্য সত্ত্বেও বাড়ির পরিবেশ, সঙ্গীসাথি (বন্ধুবান্ধব, তাদের কাজকর্ম, ব্যস্ততা ইত্যাদি) এবং সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেন আমরা শিশুর বিকাশে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ আত্মিক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে পারি।

ঘরের পরিবেশ : আগে ঘর, তবে তো পর

ঘর হলো একটি অভয়ারণ্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। আল্লাহ বলেছেন,

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস।’
(সূরা নাহল, ১৬ : ৮০)

ঘর হলো আশ্রয়, নিরাপত্তা, প্রাইভেসি এবং আনন্দের উৎস। শিশুর পরিচর্যা ও বিকাশের কেন্দ্রস্থল এই ঘর। শিশুরা তাদের অধিকাংশ মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আচার-আচরণ গঠন করে বাড়ির লোকদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে। প্যারেন্টিং-এর দায়িত্ব ও প্রভাব বুঝে থাকলে পিতা-মাতার উচিত বাড়িতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে ঈমান বিকশিত হতে পারে। কিছু দিক-নির্দেশিকা অনুসরণের মাধ্যমে এটি অর্জন করা সম্ভব। সেই দিক-নির্দেশিকাগুলোর কেন্দ্র হলো এমন বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করা—যা উত্তম ও কল্যাণকর। সেই সাথে সেসব বিষয় বাড়ি থেকে অপসারণ করা—যা ক্ষতি ও মন্দ পরিণতি বয়ে নিয়ে আসে।

বাড়িতে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করুন

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না—তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।’^[১২১] ঘরকে এমন একটি স্থান বানাতে হবে যেখানে সারাদিন সব সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর স্মরণ চালু থাকে—সালাতের মাধ্যমে, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দুআ, ইসলামি আলাপ-আলোচনা, দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো নিয়মিত ভিত্তিতে চালু থাকতে

হবে যেন প্রতিনিয়ত আমাদের বাড়িতে ফেবেশতাদের আগমন ঘটে, তাবা আল্লাহর রহমত নিয়ে আমাদের ঘরে অবতরণ করবেন!

বাড়ির সদস্যদের একটি নিয়মিত কার্যক্রম হবে কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষত সূরা বাকারাহ তিলাওয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। এর মাধ্যমে শয়তানের প্রভাব থেকে ঘরকে নিরাপদ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত কোরো না। শয়তান সেই ঘর থেকে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়।’^[১২২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন, ‘তোমরা বাড়িতে সূরা বাকারাহ পড়বে, কারণ শয়তান সেই ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়।’^[১২৩] এই সূরার শেষের দুই আয়াতের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আসমান-জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ একটি দলিল লিপিবদ্ধ করেছেন। সেটা আরশের কাছে রক্ষিত, সেখান থেকে দুটি আয়াত নাযিল করে সূরা বাকারাহ সমাপ্ত করেছেন। যদি পরপর তিন রাত কোনো বাড়িতে তা তিলাওয়াত করা হয়, তবে শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না।’^[১২৪]

বাড়িতে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন

বাড়িতে ওয়াক্তমতো সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবারের সদস্যরা যেন নিয়মিত সালাত কয়েম রাখেন। এর অর্থ শুধুমাত্র সালাত আদায় করা নয়, বরং ওয়াক্তমতো খুশু-খুজুর সাথে সেটা আদায় করা। বাড়ির একটি স্থানকে সালাতের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষিত থাকে। নারীদের জন্য উত্তম হলো নিজের ঘরে প্রতি ওয়াক্তের সালাত আদায় করা। পুরুষদের জন্য নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা উত্তম। আর ফরয সালাত অবশ্যই জামাআতে মাসজিদে আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করো। কারণ, ফরয সালাত ব্যতীত নামাযের মধ্যে সে সালাতই উত্তম, যার ঘরে পড়া হয়।’^[১২৫]

তিনি আরও বলেছেন,

‘তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে (ফরয) সালাত পড়ে তখন সে যেন ঘরের জন্য তার নামাযের কিছু অংশ (নফল সালাত) রেখে দেয়। কারণ আল্লাহ তার নামাযের কারণে তার ঘরে বরকত দান করেন।’^[১২৬]

[১২২] মুসলিম : ৭৮০।

[১২৩] জামিউস সগীর : ২০৫০।

[১২৪] আহমাদ, সহীহ আল জামে।

[১২৫] বখারি . ৬১৮।

এভাবে নিজেদের ঘরকে আমরা মাসজিদের মতো একটি ইবাদাতের স্থানে পরিণত করতে পারি।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মাহমুদ ইবনু রাবি আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ‘উতবান ইবনু মালিক, যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করলেন : ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মাসজিদে পৌঁছতে পারি না। তাই তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ্য হই না। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে কোনো এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই।’ বর্ণনাকারী বলেন : তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘ইন শা আল্লাহ অচিরেই আমি তা করব।’ উতবান রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর রদিয়াল্লাহু আনহু আমার ঘরে তাশরিফ আনেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঘরের কোন স্থানে তুমি সালাত আদায় করা পছন্দ করো?’ তিনি বলেন, ‘আমি ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলাম।’ তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়লাম এবং কাতারবন্দি হলাম। তিনি দু-রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফেরালেন।’

বাড়ির লোকেরা পরস্পরকে সালাতের কথা স্মরণ করাবেন ও উৎসাহিত করবেন। আইশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতে সালাত আদায় করতেন। তিনি বিতর আদায় করতেন এবং বলতেন, ‘ওঠো আইশা, বিতর আদায় করো।’^[১২৭] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ ধন্য করুন, যে রাতে উঠে সলাত পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, তারপর সেও সলাত পড়ে। আর যদি সে (স্ত্রী) জাগতে অস্বীকার করে, তা হলে স্বামী তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলাকে অনুগ্রহ ধন্য করুন, যে রাতে উঠে সলাত পড়ে এবং তার স্বামীকেও জাগায়, আর সেও সালাত পড়ে। স্বামী জাগতে অস্বীকার করলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।’^[১২৮]

এই নিয়মগুলো শিশুদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, বিশেষ করে যখন তারা সালাত আদায়ের

[১২৭] মুসলিম : ৭৪৪।

[১২৮] আবু দাউদ : ১৪৫০।

বয়সে উপনীত হয়।

শিক্ষাদান ও গ্রহণ একটি চলমান প্রক্রিয়া

প্রতিটি মুসলিম বাড়িতে শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম হতে হবে। দ্বীনের ইলম অর্জন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এর ভিত্তিতে ব্যক্তির ঈমান বিকশিত হবে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকেই এটা নিশ্চিত করতে হবে। এটা তার দায়িত্ব যে, তিনি পরিবারকে সঠিক পথে চালিত করবেন, তাদেরকে ভালো কাজে উৎসাহিত করবেন এবং মন্দকাজে নিষেধ করবেন। পিতা-মাতার উভয়কে সম্ভানের শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তাকে সঠিক ইসলামি আকীদা, ঈমানের রুকনসমূহ, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ শিক্ষাদান এবং কুরআন হিফয করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে নিয়মিত তালিমের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে আলোচিত বিষয় থেকে পরিবারের সবাই উপকৃত হতে পারবে। বিশেষভাবে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা সেখানে অংশগ্রহণ করে। কেননা, এর মাধ্যমে এমন একটি রূপরেখা গড়ে উঠবে যার ভিত্তিতে তারা তাদের বাকিটা জীবন পরিচালিত করবে। শিশুরা বড় হলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। ইলম অর্জনের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আলিমদের আলোচনা, বক্তব্য, ওয়াজ, কুরআন তিলাওয়াত শোনা এবং ইসলামি ঘটনা, ইতিহাস ইত্যাদির অডিও, ভিডিও আলোচনা সিডি, ক্যাসেট বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা। ইলম অর্জনের নানা পদ্ধতি রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ!

বাড়িতে একটি ইসলামি লাইব্রেরি তৈরি করুন

প্রতিটি মুসলিম ঘরে তাদের নিজেদের মতো করে একটি ছোট ইসলামি লাইব্রেরি রাখা উচিত। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বই পুস্তক, অডিও, ভিডিও, সিডি ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সংগৃহীত বই-পুস্তক ও অন্যান্য কন্টেন্টগুলো যেন বিশুদ্ধ, সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য হয়। বাড়িতে বিভিন্ন বয়সের সদস্যদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকম ম্যাটারিয়াল সংরক্ষণ করতে হবে। আরবি ভাষার উপর বই পুস্তক থাকা জরুরি, কেননা বাড়ির সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে জানতে হবে কীভাবে কুরআন পাঠ করতে হয়। বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় বিষয়ের উপর বই পুস্তক সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলোকে এভাবে সাজাতে হবে যেন সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। ওয়াজ মাহফিলের অডিও আলোচনা, সিডি, মেমরি ইত্যাদি সংগ্রহে রাখা যায়। কুরআন তিলাওয়াত শোনার ব্যবস্থা, শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন অডিও, দুআর অডিও, ইসলামি আখলাকের উপর স্মরণিকা এবং হামদ-নাত ও বাদ্যযন্ত্র-বিহীন নাসিদের অডিও থাকতে পারে। পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে উৎসাহিত করবেন যেন নিয়মিত সেই উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয়। এমনকি প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য মুসলিম পরিবারের সাথে সেগুলো আদান প্রদান

করা যেতে পারে।

শিশুদের গৃহ-সম্পর্কিত দুআ এবং ইসলামি নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিন

বাড়ির সদস্যদেরকে অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করতে হবে। ঘরে প্রবেশের সময় আমরা বলব, ‘বিসমিল্লাহ! আল্লাহর নামে’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং খানা খায় তখন শয়তান বলে, ‘এখানে তোমার কোনো খাবার নেই, থাকার জায়গাও নেই।’ আর যদি সে আল্লাহর নাম না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং খানা গ্রহণের সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, ‘তোমার একটি থাকার জায়গা হয়ে গেল, খাবারের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।’^[১২৯] ঘরে প্রবেশের একটি সুনির্দিষ্ট দুআ রয়েছে, সেটি হলো,

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আল্লাহর নামে আমরা (ঘরে) ঢুকি, আল্লাহর নামে (ঘর থেকে) বের হই, আর আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা রাখি।

ঘর থেকে বের হবার সময়ও আমরা দুআ পড়ব। দুআটি হলো,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى

“আল্লাহর নামে (বের হলাম), আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।”

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘কোনো ব্যক্তি যখন তার ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়, তখন দুজন ফেরেশতাকে তার সঙ্গী হিসাবে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে হিদায়াত দান করা হয়েছে। যখন সে বলে আল্লাহ ব্যতীত ক্ষতি রোধ করার বা কল্যাণ লাভ করার শক্তি কারও নাই, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। যখন সে বলে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, তখন তারা বলেন, তোমার জন্য (আল্লাহ) যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তার জন্য নিযুক্ত দুই সাথি (কারিন, শয়তান) সাক্ষাৎ করে। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তোমার আর কীই-বা করার আছে, যাকে সুরক্ষা ও সঠিক পথের দিশা দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট।’^[১৩০]

গৃহের সাথে সম্পর্কিত বেশ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো মুসলিমদের জেনে নেওয়া উচিত। তার মধ্যে রয়েছে ঘরের গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) রক্ষা করা, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়া (নক করা), অন্যের ঘরে উঁকিঝুঁকি না মারা এবং পিতা-মাতার শয়নকক্ষে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে শিশুদেরকে প্রবেশ না করা। ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশের বিষয়টি আল্লাহ অবগত করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

‘হে ঈমানদারগণ! নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো এবং তাদেরকে সালাম করো। এটিই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবো। তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তা হলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও; তা হলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশি শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এবং যা-কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।’ (সূরা নূর, ২৪ : ২৭-২৮)

বিনা অনুমতিতে অপর ব্যক্তির ঘরে উঁকিঝুঁকি মারা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘কোনো ব্যক্তি যদি কারও ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁটা করে দেয়, তবে সে দিয়াত এবং বদলা—কিছুই পাবে না।’^[১৩১] আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ‘জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো গৃহের দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট চিরুনি-সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এটা দিয়ে তিনি মাথা চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ তাকে দেখলেন তখন বললেন, যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তা হলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ বলেন, দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যই তো অনুমতি-গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।’^[১৩২]

শিশুদের জানিয়ে দিতে হবে যে দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময় রয়েছে যদি সেই সময়গুলোতে তারা পিতা-মাতার কক্ষে প্রবেশ করতে চায় তা হলে অবশ্যই তাদেরকে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। এই সময়গুলো হলো ফায়র সালাতের পূর্বে, দুপুরে ঘুমের সময় এবং ঈশার সালাতের পর। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

[১৩১] আহমাদ : ৮৯৯৭।

[১৩২] বুখারি : ৬২৪১।

مَرَاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী এবং তোমাদের এমন সন্তান যারা এখনও বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছেনি, তাদের অবশ্যই তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত—ফাজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং ঈশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এরপরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই এবং তাদেরও না। তোমাদের পরস্পরের কাছে বারবার আসতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।’ (সূরা নূর, ২৪ : ৫৮)

একজন ব্যক্তির প্রাইভেসিকে ইসলামে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে, যেমনটা উল্লিখিত আয়াতে এসেছে। এই বিষয়টি সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাড়িতে থাকতে হবে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাড়িতে মেহমান এলে নারী-পুরুষরা পৃথকভাবে বসবে। নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশা করা যাবে না। এর মাধ্যমে ফিতনা তৈরি হয়। অস্বস্তিকর, বিরতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমন্ত্রিত-অতিথি, বাড়িতে-আগত-দর্শনাথী মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম—উভয় ক্ষেত্রেই এই বিষয় প্রযোজ্য। এটা আপনার ঘর, আপনার ঘরের নিয়ম। কাজেই যারা আপনার বাড়িতে আসছে তাদেরকে সেই নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

নেককার ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো

আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।’ (সূরা নূহ, ৭১ : ২৮)

নেককার, সংকর্মশীল এবং বুজুর্গ ব্যক্তির তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে অনেক বরকত ও উপকার নিয়ে আসে। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনায়ও বরকত রয়েছে। কেননা, তারা এমন বিষয়ে কথা বলেন যেগুলো উপকারী এবং এই কথোপকথনের মাধ্যমে ইলম অর্জন করা যায়। সব সময় আল্লাহর কাছে আমাদের দুআ করা উচিত যেন তিনি আমাদেরকে

নেক ব্যক্তিদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব দান করেন, তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গী হোয়ো না এবং মুত্তাকী (পরহেজগার) ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।’^[১৩৩]

ঘর থেকে নেতিবাচক প্রভাবগুলো দূর করুন

ঘর থেকে সকল ক্ষতিকর ও নেতিবাচক উপাদানসমূহকে অপসারণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, বাদ্যযন্ত্র, মিউজিকের উপাদান, গান বাজনার সিডি, ক্যাসেট, মেমরি, কুকুর, মূর্তি, প্রাণীর ছবি ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

টেলিভিশন

আফসোসের বিষয়, আজকাল অনেক মুসলিম ঘরে টেলিভিশনকে একটি সাধারণ নিত্য-ব্যবহার্য উপাদান বলে মনে করা হয়! অথচ যদি বাড়ি থেকে টেলিভিশন ফেলে দেওয়া হয় তা হলে এটা নিয়ে পিতা-মাতা যে-কোনোদিন আফসোস করতে হবে! অনেকে যুক্তিতর্ক পেশ করে বলেন যে টেলিভিশনের কিছু উপকারিতাও রয়েছে। যেমন : নানা রকম শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পারি। তবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বোঝা যায়, উপকার অপেক্ষা টিভির ক্ষতি ও বিপদের দিক অনেক বেশি। বাড়িতে একটি কার্যকর ঈমানি পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য টেলিভিশনের মতো মনোযোগ বিনষ্টকারী উপাদান অপসারণ করা খুবই জরুরি। যদি এটা সম্ভব না হয় তা হলে অবশ্যই কঠোর মনিটরিঙের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোন অনুষ্ঠানগুলো দেখা হচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (এটা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। কারণ প্রায় সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই নানা রকম ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত থাকে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা আলোচ্য অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত আছে)।

গান-বাজনা হারাম

গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি হারাম বিষয়গুলো অবশ্যই বাড়িতে নিষিদ্ধ রাখতে হবে। এর মধ্যে সে-সকল গান অন্তর্ভুক্ত—যেখানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং এমন সব লিরিক ব্যবহার করা হয়েছে যা মানুষকে হারাম কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

‘আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মূর্খতাবশত ‘অবাস্তব কথাবার্তা’ কথা কিনি আনে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথের আহ্বানকে হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরনের

লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাবা' (সূরা লুকমান, ৩১ : ৬)

এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'অবাস্তব কথাবার্তা' (الْهَوَى الْخَيْبِ) এর অর্থ এমন বিষয়সমূহ যাতে কোনো কল্যাণ নেই। বানানো ঘটনা, কেছা-কাহিনি, গল্প ইত্যাদি যেভাবে এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে গান-বাজনা, মিউজিক এগুলোও অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ অর্থে যে-সকল উপাদানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মনোযোগ বিনষ্ট হয় এবং কুরআন ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিপথে পরিচালিত হয়—সবগুলোই উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, (বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার ব্যতীত) ইসলামি গজল শোনা নিষিদ্ধ নয় যেখানে বিজ্ঞতা, উপদেশ, নেককাজে উৎসাহ ও উত্তম আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়। এভাবে সে-সকল গজল শোনাও বৈধ যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামি চিন্তাধারা ও অনুভূতি জাগ্রত করা হয়, শ্রোতাকে শরীআত অনুসারে আল্লাহর আনুগত্যে অনুপ্রাণিত করা হয়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয় ও আল্লাহর রাহে জিহাদের প্রেরণা দেওয়া হয়। ঈদ, বিবাহ, জিহাদের সফর, একঘেয়েমির অবসান ঘটিয়ে ইবাদাতের প্রেরণা সৃষ্টি করার কাজে ইসলামি গজল ও নাশিদ শোনা যেতে পারে। তবে এগুলো শুনতেই হবে এমন নয়। আবার নিয়মিত শ্রবণের অভ্যাস তৈরি করে ফেলাও অনুচিত।

ছবি, মূর্তি এবং কুকুর

মুসলিমদের ঘরকে অবশ্যই যে-কোনো ধরনের প্রাণীর ছবি (হাতে আঁকা বা প্রিন্টেড ফটোগ্রাফ), মূর্তি, কুকুর ইত্যাদি মুক্ত হতে হবে। কেননা, এ সকল উপাদানের কারণে বাড়িতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করে না।'^[১৩৪] ছবির ব্যাপারে নিয়ম হলো কোনো প্রাণীর ছবি থাকা চলবে না তবে প্রাণহীন বস্তু কিংবা গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ছবি বৈধ। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে অনুকরণ করার গুনাহ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'বিচার-দিবসে ছবি প্রস্তুতকারীকে শাস্তি প্রদান করা হবে। বলা হবে, 'যা তৈরি করেছ তাতে প্রাণ প্রদান করো!'^[১৩৫] তিনি আরও বলেছেন, 'যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নকল করার চেষ্টা করে বিচার-দিবসে তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।'^[১৩৬] প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা যেমন হারাম, সেগুলো ব্যবহার করা, বিক্রয় করা, প্রদর্শন করাও হারাম। প্রিন্ট করা ছবির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

ঘরের ভেতরে কুকুর রাখা নিষিদ্ধ, কারণ তারা অপবিত্র। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ

[১৩৪] ইবনু হিব্বান : ৫৪৬৮।

[১৩৫] বুখারি : ৫৯৫১।

[১৩৬] বুখারি : ৫৯৫০।

(ﷺ)-এর হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। তিনি বলেছেন, ‘যদি কুকুর তোমাদের কোনো পাত্রে মুখ দেয় তা হলে সেটাকে সাত বার ধৌত করবে।’^[১৩৭] এর সঙ্গে আরেকটি সতর্কতা হলো ঘরে কুকুর থাকলে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না এবং ব্যক্তির সাওয়াব কেটে নেওয়া হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে এক কীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। তবে কৃষিকার্মার অথবা পশুরপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত শিকারি কুকুর এর ব্যতিক্রম।’^[১৩৮] কিছু নির্ধারিত ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে কুকুর রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন : পশুপাল পাহারা দেওয়া, বাড়ি পাহারা দেওয়া কিংবা কৃষিকাজে ব্যবহারের স্বার্থে। সূরা মায়িদাহর চতুর্থ আয়াত অনুসারে শিকার করার ক্ষেত্রেও তাদেরকে ব্যবহারের বৈধতা রয়েছে।

দ্বীন পালনে বাড়ির নির্মাণ-কাঠামোর ভূমিকা

বাড়ির অবস্থান মাসজিদের কাছাকাছি হলে উত্তম। কেননা, পুরুষ সদস্যরা সহজে সেখানে জামাআতে শরিক হতে পারবেন। আর যদি মাসজিদে নিয়মিত দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তা হলে পরিবারের অন্যান্যরাও সেখানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারবেন, আলোচনা শুনবেন, তালিম, দ্বিনি হালাকা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন। আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এমন স্থানে বসতি নির্বাচন করতে হবে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যায় বেশি (অমুসলিম সংখ্যাপ্রধান দেশে বসবাসের ক্ষেত্রে)। যে-সকল প্রতিবেশীরা অনৈতিক কাজে লিপ্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ে বসবাস করা থেকে সাবধান হতে হবে, তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। কোনো ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়ির লোকেশন এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন নিজেদের প্রাইভেসি রক্ষা করা যায় এবং নারী-পুরুষের জন্য পৃথক বসার ঘরের ব্যবস্থা থাকে।

বাড়িতে টয়লেটের অবস্থান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যেন সেটা কিবলামুখী না হয়। তবে অনেকে বলেছেন যদি উন্মুক্ত স্থান না হয় অর্থাৎ কোনো ভবনের অভ্যন্তরে বা দেওয়াল দেওয়া স্থান হয় তবে কিবলামুখী হলেও অনুমতি আছে। তবে সর্বোত্তম হলো যেন সেটা কিবলামুখী না হয়।^[১৩৯] স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় বাড়িতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাড়িতে টেলিভিশন রাখা সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুরা গড়ে দৈনিক তিন থেকে চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে, তারা ৬৫ বছর বাঁচলে তার মধ্যে নয় বছর কাটিয়ে দেয় টিভি বাক্সের সামনে বসে থেকে।

[১৩৭] বুখারি : ১৭২।

[১৩৮] বুখারি : ২৩২২।

[১৩৯] স্ট্যান্ডিং কমিটির ফাতওয়া : <http://www.islamqa.com/en/ref/69808>

এ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শিশুরা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ কাটিয়ে দেয় কেবল একটি বাস্তব সামনে! ফলে বাস্তব জীবনের ঘটনার চেয়ে কল্পনার জগতের ঘটনার প্রতি তারা অধিক সংযুক্ত হয়ে যায়। এর ক্ষতিকর বাস্তবতা এবং প্রায়োগিক দিক বুঝতে পারলে আপনি আতঙ্কিত হতে বাধ্য হবেন। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশের পথে টেলিভিশন একটি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। আরও আশংকার ব্যাপার হলো টেলিভিশনের কারণে শিশুদের ফিতরাত (জন্মগত বিশুদ্ধ প্রকৃতি) বিনষ্ট হতে থাকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বিশুদ্ধতা আর কখনও পুনরুদ্ধার করা যায় না।

বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের পথে বিপত্তি

জন্মের পর শিশুর মস্তিষ্কের কোষগুলো (নিউরন) পরিপূর্ণ বিকশিত অবস্থায় থাকে না। শৈশবে এগুলো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। পারস্পরিক লেনদেন, মেলামেশা, বাড়ির বাইরের নানা রকম উদ্দীপক ঘটনা, পিতা-মাতার ভালোবাসা ও যত্নের মাধ্যমে এই কোষগুলো বিকশিত হয়। এই বিকাশের পথে টেলিভিশনের একটি নেতিবাচক ভূমিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। যে নিউরন কোষগুলো শিশু সারা জীবন ব্যবহার করবে, শৈশবে টেলিভিশন দেখার ফলে সেগুলো পরিপূর্ণ বিকশিত হয় না। কারণ টিভি দেখা একটি পরোক্ষ কার্যক্রম (indirect activity), এটি প্রত্যক্ষ কার্যক্রম নয়। এ কারণে ‘আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্স’ হতে দুই বছরের নিচে শিশুদের টিভি দেখানো যাবে না মর্মে সতর্কবার্তা ঘোষণা করা হয়েছে। শিশুর অধিকাংশ মনোদৈহিক বিকাশ ঘটে শৈশবে, তবে সেটা বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর অর্থ সব বয়সের শিশু-কিশোরদের জন্য টিভি দেখার ক্ষতিকর সতর্কবার্তা প্রযোজ্য হয়। টিভি দেখার অর্থ হলো একটি শিশু টিভির সামনে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করছে না, কারও সাথে মেলামেশা করছে না, খেলাধুলা করছে না, বই পড়ছে না, কারও সাথে কোনো লেনদেন, মিথস্ক্রিয়া করছে না। অথচ এগুলো শিশুর বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এসব কার্যক্রমের মাধ্যমেই শিশু সবকিছু শেখে। টেলিভিশনের সামনে ব্যস্ত থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে এ ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারে না। সে নিজের দক্ষতার কোনো কিছু প্রয়োগ করতে পারে না, সৃষ্টিশীল হতে পারে না, সামাজিকীকরণে অংশ নিতে পারে না, খেলাধুলা করতে পারে না, লিখিত কোনো কিছু পড়তে পারে না, কুরআন পাঠ করতে পারে না। একটি অনুপকারী কাজের মধ্যে অনেক সময় নষ্ট হয়। সুতরাং যে শিশুরা বেশি টেলিভিশন দেখে তারা নিজেদের পরিপূর্ণ সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে না। বাড়ির কাজ ও স্কুলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যে-সকল শিশুদের অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স ভালো তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে গঠনমূলক কাজ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময় তারা সেভাবে ব্যয় করে। তাদের দৈনন্দিন গঠনমূলক কাজের তালিকায় টিভি দেখা অন্তর্ভুক্ত

নয়। সময়ের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা মুসলিম জীবনবোধের অংশ। আমাদের সন্তানদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

টেলিভিশন দেখা আধ্যাত্মিক ক্ষতি

মানুষের মনোজগতের উপর টেলিভিশনের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ও বিপদ রয়েছে। সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয় হলো এর ফলে আল্লাহর ইবাদাত ও স্মরণে মনোযোগ বিনষ্ট হয়। শিশুর মনোজগতে টেলিভিশন নানা ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। যারা বেশি টেলিভিশন দেখে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জামাআতে শরিক হতে পারে না। রাত জেগে টিভি অনুষ্ঠান দেখার ফলে ফাজরের সালাত ছুটে যায়, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইতিবাচক কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না। একবার ভেবে দেখুন দৈনিক তিন থেকে চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখার মাধ্যমে একজন ৬৫ বছরের মানুষ তার জীবনের পুরো নয়টি বছর কাটিয়ে দেয় একটি বাস্তব সামনে নিশ্চল বসে থেকে! এই ব্যক্তির বিপরীতে তার কথা ভাবুন, যিনি এই সময়কে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদাত-বন্দেগিতে কাজে লাগিয়েছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, ইসলামি ইলম অর্জন করেছেন। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ব্যক্তি আখিরাতের জীবনে অনেক অগ্রগামী হবেন। দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কত ব্যাপক!

অর্থহীন কার্যক্রমে সময় অপচয় ছাড়াও অনেক মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে কোমলপ্রাণ-শিশু অসংখ্য অনৈসলামি আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধ সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অনেক অনুষ্ঠান সুস্পষ্টভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আর কিছু অনুষ্ঠানে খুব সূক্ষ্মভাবে অনৈসলামি চিন্তাচেতনা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। টেলিভিশনের নানা প্রোগ্রামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সাধারণ সামাজিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বলাই বাহুল্য, সেখানে ইসলামি ড্রেসকোড রক্ষা করা হয় না, পূর্ণ সতর ঢেকে রাখা হয় না।

সেসব টিভি অনুষ্ঠানগুলোতে নানা রকম অগ্রহণযোগ্য অসামাজিক আচার-আচরণ, উগ্র মানসিকতা, বেয়াদবি, বড়দেরকে শ্রদ্ধা না করা, কাফিরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ইত্যাদি নানা রকম বিষয় থাকে। পাঠক! এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন অধিকাংশ টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয় অমুসলিম এবং সেকুলারদের মাধ্যমে। এই কথার অর্থ হলো ওই সকল অনুষ্ঠানে যে বিষয়গুলোকে ঠিক বা ভুল বলে দেখানো হয় সেসব মূল্যবোধ এবং আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে কুফরি চিন্তাচেতনা ও ইসলাম-বিরোধী মতাদর্শ। নিঃসন্দেহে এসবের সাথে মুসলিম পরিবারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক ব্যাপার হলো এই মূল্যবোধগুলো শিশু নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে আত্মীকরণ করে ফেলে, এগুলো তার ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যায়! ছোটদের সামনে

যা উপস্থাপন হয় সবকিছুকেই তারা সরলমনে গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের ‘থিংকিং প্যাটার্ন’-এর অংশ হয়ে যায়। এসবের ভিত্তিতে জীবনকে দেখতে শেখে। বড়দের মত বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তি শিশুদের নেই, ফলে তারা বিনাপ্রশ্নে সকল তথ্য গ্রহণ করে নেয়। এই কথার অর্থ হলো টিভিতে (কিংবা বড়দের মাধ্যমে) যা-কিছু ঘটতে দেখে সবকিছুকে শিশুরা সত্য ও বাস্তব বলে বিশ্বাস করে। ছোট্ট শিশুরা বাস্তব এবং কল্পনার জগৎকে পৃথক করতে বেগ পায়। তারা সবকিছুকেই বাস্তব এবং কল্যাণকর মনে করে। এভাবে তাদের অনুভূতিশক্তি ভেঁতা হয়ে যায়। ফলে টিভি পর্দায় দেখানো সকল অদ্ভুত আচরণ তাদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়।

উপরন্তু টেলিভিশনকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ‘মডেলিং’ যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশুরা চারপাশের পরিবেশ ও মিডিয়া থেকে যা দেখে সবকিছু নকল করে। এর অর্থ টিভি অনুষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র শিশুদের ‘থিংকিং প্যাটার্ন’ গঠন করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তাদের আচার-আচরণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুরা টিভিতে উগ্র-অনুষ্ঠান দেখে তাদের আচরণে উগ্রতা সৃষ্টি হয়। টেলিভিশনের এসব ক্ষতিকর প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রভাব সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং দুর্লভ। এসব হুমকির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর নিরাপদ পদ্ধতি হলো শুরু থেকেই নিজে থেকে এসব ক্ষতির সামনে উন্মুক্ত না করা ও যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা।

টেলিভিশন আরেকটি বিপদ ঘটায় বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। বস্তুবাদী চিন্তাধারা (materialism) ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজের প্রধান ভিত্তি। বস্তুবাদী জীবনের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আনন্দ করা এবং ধনসম্পদ জমা করা। এখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি গুরুত্বহীন, ভোগবাদই মুখ্য। অধিকাংশ পাবলিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ বা অল্প কিছু মানুষকে ধনী থেকে আরও ধনী বানানোর লক্ষ্যে সাধারণ মানুষদেরকে যত বেশি সম্ভব প্রলুব্ধ করে অর্থ খরচে উৎসাহিত করা। নানা রকম টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুব সচেতনভাবে একটি ‘কনজুমার সোসাইটি’ গঠন করা হয়। (নানা রকমের চাকচিক্য ও প্রলুব্ধকর বিজ্ঞাপন দেখে) শিশুরা নিত্যনতুন ‘লেটেস্ট’, ‘হটেস্ট’ পণ্য পিতা-মাতার কাছে আবদার করতে শুরু করে। এভাবে তারা ভোগবাদী মানসিকতার ফাঁদে আটকে পড়ে। উন্নত মূল্যবোধের পরিবর্তে কেবল পরিতৃপ্তি অর্জনকে তারা নিজেদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে ফেলে— সমাজের অসহায় পীড়িতদের সাহায্য প্রদান করার মানসিকতা হারিয়ে যায়। মুসলিম হিসেবে বস্তুবাদের এই ফাঁদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে ধনী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের সন্তানদের জন্য এটা অধিক জরুরি। ভুলে গেলে চলবে না দুনিয়াবি বস্তুগত সম্পদের চেয়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার শ্রেষ্ঠ ও বরকতময়।

টেলিভিশনের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো এর মাধ্যমে নানা রকম কুফর ও

শিরকের বিস্তার ঘটানো হয়। যদি আপনি শিশুদের জন্য প্রস্তুতকৃত টিভি অনুষ্ঠানগুলোকে বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে দেখেন তা হলে সুস্পষ্টভাবে সেখানে কুফর এবং শিরকের প্রকাশ্য উপস্থিতি দেখতে পাবেন। এর বাইরেও রয়েছে নানা রকম সূক্ষ্ম কুফর এবং শিরকি আদর্শের বিস্তার। বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা কার্টুনে কিছু ব্যক্তিদেরকে ‘সুপার হিউম্যান’ বা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখানো হয়। তাদের মধ্যে এমন শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে বলে উপস্থাপন করা হয় যা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। মানুষের বিপদে তারা রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়! অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা কিংবা পৃথিবীকে মন্দ বিষয় থেকে উদ্ধার করার জন্য সেই সুপারহিরোরা (যদিওবা সেই চরিত্রগুলো কাল্পনিক) এমন সব ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয় যা কখনোই আল্লাহ অন্য কাউকে প্রদান করেন না, বরং সেগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। সে কাল্পনিক চরিত্রগুলো সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের উপরে কোনো শক্তির সত্তা তথা আল্লাহর অস্তিত্ব উল্লেখ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে জাদুবিদ্যার প্রয়োগ ও ব্যবহার দেখানো হয়—যা কুফর ও শিরক।

যখন প্রাত্যহিকভাবে শিশুরা এসব দেখতে থাকে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে (১) জীবনের প্রত্যাশা পূরণের জন্য তারা অন্যান্য শক্তি বা সত্তার উপর ভরসা করতে পারে, (২) আল্লাহর মতো ক্ষমতাবান আরও অনেক সত্তা রয়েছে, (৩) আল্লাহ বলে কিছু নেই!

এভাবে এ সকল ‘শিশুতোষ’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানাভাবে সেসব কাল্পনিক চরিত্র এবং শক্তির উপাসনা করানো হয়, আর বস্তুবাদী চিন্তাধারার ক্ষতি তো রয়েছেই।

শিশুর সাথিদের প্রভাব

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

‘আর নিজের অন্তরকে তাদের সম্মুখভে নিশ্চিত্ত করো, যারা নিজেদের রবের
সম্মুখিত্তির সম্মুখনে সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনও তাদের দিক থেকে দৃষ্টি
ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো? এমন কোনো লোকের আনুগত্য
কোরো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে
নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনও
উগ্র, কখনও উদাসীনা’ (সূরা কাহাফ, ১৮ : ২৮)

সাথিদের ভূমিকা

৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুরা সাধারণত যতটুকু সময় জেগে থাকে তার শতকরা চল্লিশ
ভাগ সময় কাটায় খেলার সাথিদের সাথে—যারা তার কাছাকাছি বয়স ও সামাজিক মর্যাদার
অধিকারী। ৬ বছরের কম বয়সী শিশুরা খেলার সাথিদের সাথে এর অর্ধেক সময় কাটায়।
সাথিদের সাথে যত বেশি সময় কাটাতে থাকে পিতা-মাতার সাথে কাটানো সময়ের পরিমাণ
তত কমতে থাকে। আর যখন শিশুরা বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে তখন সাথিদের সাথে
সংশ্লিষ্টতা আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। গড়ে টিনেজ বয়সীরা তাদের পিতা-মাতা বা অন্যান্য
প্রাপ্তবয়স্ক পরিবারের সদস্যদের সাথে যত সময় কাটায় তার দ্বিগুণ সময় কাটায় স্কুলের
বাইরে অন্যান্য সাথিদের সাথে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এভাবে শিশু প্রাপ্তবয়স্ক
হয় ও তার সামাজিক রূপান্তর ঘটে।

শৈশবে ও বয়ঃসন্ধিকালে খেলার সাথিদের সাথে যত সময় কাটায় তত তাদের
মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব বিভিন্নভাবে কাজ করে। সাধারণ পরিভাষায় একে

বলা হয় ‘পিয়ার (peer) প্রেসার’। শিশু-কিশোররা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে নানা রকমের চাপ অনুভব করে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভাবতে ও আচার আচরণ করতে বাধ্য হয়। টিনেজ বয়সে তারা পিতা-মাতা কিংবা পরিবারের অন্যান্য বড় সদস্যদের থেকে তার বন্ধু-বান্ধবের মতামতে বেশি প্রভাবিত হয়। এই সামাজিক প্রভাব একটি উভমুখী প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোররা শুধু নিজেরাই প্রভাবিত হয় না, বরং তারাও তার সাথীদেরকে প্রভাবিত করে। যাদের সাথে তার আচার-আচরণ মিল থাকে তাদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমতো বন্ধু নির্বাচন করে।

তবে আশার কথা হলো অধিকাংশ বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরী সাথীদের চাপে অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করার থেকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য (pro-social) আচরণ বজায় রেখে চলতে চায়।

বন্ধু বান্ধবদের সাথে ক্রমবর্ধমান হারে সময় কাটানোর মাধ্যমে শিশু ও পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিয়িত হয়। শিশু বড় হতে থাকলে প্যারেন্টিং-এর ভূমিকা হ্রাস পেতে থাকে এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও পিতা-মাতার প্রভাব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় কিন্তু অধিকাংশ বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরী পিতা-মাতার শেখানো মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকে। এভাবে পিতা-মাতার শেখানো মূল্যবোধ বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

ভালো বন্ধু নির্বাচন

পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে যেন তাদের সন্তান নেককার এবং মুখলিস (আন্তরিক) মুসলিম সাথীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সেগুলোর উপর ঈমান রাখে এবং ইসলামের নীতিসমূহ মেনে চলে—তাদের মধ্য থেকেই বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। যাদের আচার-আচরণ শোভনীয় নয়, যারা দ্বীনের প্রতি উদাসীন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির ধার ধারে না—তাদের সংসর্গ পরিহার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই সতর্কতার সাথে বন্ধু নির্বাচন করবে।’^[১৪০] যে-কোনো ব্যক্তির চরিত্রের উপর তার বন্ধুর মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। এ বিষয়ে সামাজিক ও সাইকোলজিকাল গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু তথ্য-উপাত্ত পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সং ও নেককার মুসলিমের বন্ধুত্ব ভারসাম্যপূর্ণ পথের উপর টিকে থাকার জন্য একটি জরুরি প্রভাবক।

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর (সুগন্ধী) বিক্রেতা ও কর্মকারের হাঁপরের ন্যায়। আতর-বিক্রেতার থেকে হয়তো তুমি আতর খরিদ করবে, নয়তো আতরের সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাঁপর হয়তো

[১৪০] আবু দাউদ : ৪৮৩৩; তিরমিযি : ২৩৭৮।

তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, নয়তো তুমি দুর্গন্ধ পাবে।^[১৪১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তম বন্ধুর দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন আতর বিক্রেতার সাথে। যে বন্ধুর মধ্যে উত্তম আচরণ, তাকওয়া ও জ্ঞান রয়েছে সে অন্য বন্ধুর মধ্যে নিজের সদৃশ্য ছড়িয়ে দেয়। দ্বীনদার বন্ধুর সাহচর্য পাবার মাধ্যমে উপকারী ইলম, উত্তম আখলাক এবং নেককাজের সুযোগ লাভ হয়। আর যারা বদকার, ফাসেক ও গুনাহের কাজ করে তাদের সাথে ওঠাবসা করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিষেধ করেছেন। তাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন হাঁপরে ফুঁ দেওয়া কামারের সাথে। পাপী ব্যক্তির সাহচর্য লাভের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি উপকারী ইলম, উত্তম আখলাক এবং নেক আমল থেকে বঞ্চিত হয়। এমন বন্ধুর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে একজন মুসলিম ভুল কাজে উৎসাহিত হয়, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, বে-নামাযি বন্ধুদের সাথে গল্প-আড্ডায় একত্রে অবস্থানরত নামাযি বন্ধু তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে উঠে যেতে সংকোচ অনুভব করতে পারে। উঠে ওয়ু করতে সংকোচ অনুভব করতে পারে। এভাবে তার বন্ধুরা তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বিচার-দিবসে কাফিররা গুনাহগার ব্যক্তিদের বন্ধুত্বের কারণে আফসোস করবে। আল্লাহ সে ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ

فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

‘যালিমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, “হায়! যদি আমি রাসূলের সহযোগী হতাম। হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হায়! যদি আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনার কারণে আমার-কাছে-আসা-উপদেশ আমি মানিনি; মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।’ (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৭-২৯)

অপরদিকে, সেদিন ঈমানদার বান্দাদের জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করা হবে। তাদের সাথি ও বন্ধুদেরকেও এই সুসংবাদ প্রদান করা হবে। আল্লাহ বর্ণনা করে বলেছেন,

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢٧﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٢٨﴾

‘যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দূশমন হয়ে যাবে। যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনেছিল এবং আমার আদেশের অনুগত হয়েছিল, সেদিন তাদের বলা হবে, হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং কোনো দুঃখও আজ তোমাদের স্পর্শ করবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশি করা হবে।’

(সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৮-৭০)

‘মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দূশমন হয়ে যাবো’—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ আলি রদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন,

“দুই ঈমানদার বন্ধুর মধ্যে একজনের মৃত্যু হলো ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করল। তখন সে দুনিয়াতে রয়ে-যাওয়া বন্ধুর কথা স্মরণ করে বলল, ‘হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু। সে আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্যের উপদেশ দিত, সংকাজের আদেশ করত, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করত। আর আমাকে এই সংবাদ দিত যে আমাকে একদিন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে আপনি তাকে বিভ্রান্ত করবেন না, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান যেভাবে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তাকে বলা হবে, ‘তুমি যদি জানতে যে আমার নিকট তার জন্য (তোমার বন্ধুর জন্য) কী রয়েছে, তবে তুমি অনেক বেশি হাসতে এবং কম কাঁদতো’ এরপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু হয়ে গেলে দুইজনের আত্মা একত্র হয়। তখন বলা হবে, ‘একজন অপরজনের প্রশংসা বর্ণনা কর। তখন প্রত্যেকেই তার বন্ধু সম্পর্কে বলতে থাকবে, ‘তুমি আমার উত্তম ভাই! আমার উত্তম সঙ্গী ও উত্তম বন্ধু!’

আর যখন দুই কাফির বন্ধুর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় এবং জাহান্নামের সংবাদ লাভ করে তখন সে দুনিয়ার বন্ধুর কথা স্মরণ করে বলে, ‘ইয়া আল্লাহ! আমার বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের নাফরমানীর পরামর্শ দিত, আমাকে মন্দ কাজের আদেশ করত এবং নেক কাজ করতে নিষেধ করত। আর এই সংবাদ দিত যে আপনার সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ হবে না! অতএব আমার পরে যেন সে হিদায়াত না পায়, তার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান যেভাবে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন!’ অতঃপর দ্বিতীয় জনের মৃত্যু হয়ে গেলে দুইজনের আত্মা একত্র হবে এবং একে অপরকে বলতে শুরু করবে, ‘তুমি আমার নিকৃষ্ট বন্ধু ও নিকৃষ্ট সাথি!’^[১৪২] ইবনু আবু হাতিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

নেক ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসা করার উপকার বলে শেষ করা যাবে না। আখিরাতে সেই উপকারিতা আরও স্পষ্টভাবে বুঝে আসবে। আল্লাহ অভিমুখী এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি যখন তার মতো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আরেকজন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে পায়—এটা আল্লাহর রহমত। পারস্পরিক বন্ধুত্বের মাধ্যমে তারা একত্রে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের সুনাত অনুসরণ ও সংকাজে পরস্পরকে উৎসাহিত করতে পারে। অপরদিকে যে ব্যক্তির সাহচর্য একজন ব্যক্তিকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের সুনাত অনুসরণ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, সালাতের কথা

[১৪২] তাফসীর ইবনু কাসীর, ভলিউম ৮, (২০০০) রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুস সালাম প্রকাশন।

তুলিয়ে দেয়, যে তাকে আশ্চর্যিক নাসিহা প্রদান করে না—সে কখনও বন্ধু নয়, বরং সে শত্রু।

শৈশব থেকেই পিতা-মাতার উচিত সন্তানদেরকে নেক ব্যক্তিদের সাহচর্যের সাথে যুক্ত করে দেওয়া। তাদেরকে নিয়মিত মাসজিদে নিয়ে যাওয়া, ইসলামিক স্কুল-মাদ্রাসায় পড়ানো এবং মুসলিম সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা। এর মাধ্যমেই সন্তান উত্তম সাহচর্য লাভ করে। এভাবে তারা তাকওয়ার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গঠন করার সুযোগ পাবে। আরেকটি গ্র্যাকটিসিং মুসলিম পরিবারের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে আপনার সন্তান অন্যান্য শিশুদের দেখতে পাবে যারা আল্লাহর ইবাদাত করছে। এভাবে তাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর ইবাদাতের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে।

পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য উত্তম বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করতে এই প্রয়াশগুলো মাধ্যম রাখতে পারেন :

১. যে কারণে আমার সন্তান পৃথিবীতে এসেছে (আল্লাহর ইবাদাতের জন্য) সেই উদ্দেশ্য পূরণে কি তারা সহযোগিতা করবে? নাকি এই উদ্দেশ্য থেকে আমার সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিবে?
২. তারা কি আমার সন্তানের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইবে? নাকি এ বিষয়ে তাদের কোনো ভাবনা নেই?
৩. তারা কি আমার সন্তানকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে, নাকি জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে?

আল্লাহকে ভালোবাসার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে; (১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবকিছুর থেকে প্রিয়; (২) যে তার ভাইকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসে; (৩) কুফরিতে ফিরে যাওয়ায় যে আগুনে নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো ঘণা করে।’^[১৪৩]

ইসলামি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। এই গুণ ধারণ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে। যখন একজন মুসলিম আরেক জন মুসলিম ভাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবেসে বন্ধু বানিয়ে নেয়, তখন তাদের বন্ধুত্ব এমন বন্ধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা কখনও ছিন্ন হবার নয়। সেই বন্ধন হলো আল্লাহর উপর ঈমানের বন্ধন। এই বন্ধনের মাধ্যমে তাদের অন্তর এবং মন একটি বিশেষ ও অনন্য উপায়ে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়। নিজেদের যে-কোনো কিছু কুরবান করার মাধ্যমে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সাধি হয়ে যায়। কেননা, তাদের কুরবানির মাধ্যমে তারা উভয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকে। দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

তাদের মধ্যে কোনো লেনদেন হয় না।

বাসুল্লাহ (৯) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন, 'ওহ! কোথায় তোমরা? যারা আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছিলেন? আজ আমি তোমাদেরকে আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া নেই।'^[১৪৪]

দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার ভিত্তিতে যাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারা বিচারের দিনে আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়া লাভ করবেন যেদিন ওই ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। এই ভালোবাসার বিনিময়ে যে বিরাট পুরস্কার আল্লাহ সংরক্ষিত রেখেছেন তা আমাদের চিন্তাশক্তির বাইরে। আমরা তা অর্জনের যোগ্য নই তবুও আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এত বড় পুরস্কার প্রদান করবেন। এর মাধ্যমে পরস্পরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসার গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

'একব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসকারী তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য পথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিলেন। যখন সে রাস্তায় নেমে এল, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা-পোষণ করছেন? জবাবে লোকটি বলল, ওই শহরে আমার (দ্বীনি) ভাই থাকে; তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তার কাছ থেকে কোনো আকর্ষণীয় জিনিস পাওয়ার চেষ্টা করছেন? লোকটি বলল, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমি তাকে ভালোবাসি; এর পিছনে অন্য কোনো স্বার্থ নেই। ফেরেশতা তাকে বললেন, আমি আল্লাহর দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি শুধু এ কথা জানানোর জন্য যে, আপনি যেভাবে ওই লোকটিকে ভালোবাসেন আল্লাহ সেভাবেই আপনাকে ভালবাসেন।'^[১৪৫] সুতরাং দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারি।

ঈমানি দৃষ্টিকোণ থেকে, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনের অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এবং ভরসা করা। এর অনিবার্য ফল হলো পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, মৈত্রী এবং আনুগত্য। 'আল্লাহর জন্য আনুগত্য' কথাটির অর্থ—যারা তাঁর অনুগত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, যদিও এর জন্য ত্যাগ-স্বীকার করতে হোক না কেন। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্বের মাধ্যমে মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী ভৌগলিক অবস্থান থেকে দূরে নির্বিশেষে পারস্পরিক মিত্রতা স্থাপন করে ও জোট গঠন করে। দ্বীনি বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সকল দুনিয়াবি বাধাকে অতিক্রম করে যায়—হোক সেটা সংস্কৃতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা আর্থসামাজিক মর্যাদা। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্বের চেয়ে উত্তম কোনো বন্ধুত্ব নেই।

[১৪৪] মুসলিম : ২৫৬৬।

[১৪৫] মুসলিম : ২৫৬৭।

সামাজিক পরিবেশ

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

‘আর তোমাদের এ উম্মাত হচ্ছে একই উম্মাত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো।’ (সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৫২)

সমাজ হলো এমন একদল মানুষের সমষ্টি যাদের মধ্যে অভিন্ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও অধিকার থাকে। অভিন্ন বিষয় ধারণের মাধ্যমে সমাজের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে পরিধি আরও বিস্তৃত করতে হবে। একটি কার্যকরী সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধতা, সংযুক্ততা, সহযোগিতা ও কর্মোদ্যম। একটি সত্যিকার ইসলামি বার্তাবাহী মুসলিম সমাজের মধ্যে এ ধরনের সব উপাদান বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ বলেছেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

‘আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি ‘মধ্যপন্থী’ উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর সাক্ষী হতে পারো এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের উপর সাক্ষী।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩)

ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী হিসেবে আমরা সকল মানুষের কাছে আদর্শ। বিশেষত পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদেরকেই আদর্শ দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। এটি আমাদের সমষ্টিগত দায়িত্ব এবং এই বিষয়টি খুবই গুরুত্ব-সহকারে বিবেচ্য। যখন আমরা নিজেরা ইসলাম পালনে ব্যর্থ হই কিংবা আমাদের সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে বড় করতে ব্যর্থ হই—এর ক্ষতি শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সম্পূর্ণ উম্মাহতে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

নতুন প্রজন্মের সদস্যরা তাদের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ, আচার-আচরণ ইত্যাদি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে গ্রহণ করে না, বরং বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী বা গ্রুপ থেকেও গ্রহণ করে—যাদেরকে তারা রেফারেন্স মনে করে। নতুন প্রজন্মের অন্তরে ঈমানের পরিচর্যা এবং ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া খুব জরুরি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে কোনো-না-কোনো সামাজিক দল বা গোষ্ঠীর প্রতি টান অনুভব করে—তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মিল খুঁজে পায়।

কোনো বিধর্মী বা বিজাতীয় আদর্শ নয়, মুসলিম যুবক যুবতীদেরকে মুসলিম সমাজ থেকেই দৃষ্টান্ত (রেফারেন্স) নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে তরুণদের কাছে <সমাজকে> পৌঁছাতে হবে। তরুণরা যেন অনুভব করে তারা মুসলিম-সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাদের অনেক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করতে হবে। যদি এই উপাদানগুলো উপস্থিত না থাকে তবে তরুণরা অবধারিতভাবেই অন্যান্য ‘রেডিমেড’ অপশনের দিকে হাত বাড়াবে।

শিশুকে মুসলিম-জাতির সাথে সংযুক্ত করুন

শিশুদের মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব শিক্ষা দিতে হবে। তারাও মুসলিম জাতির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এই অনুভূতি যেন তাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই মুসলিমরা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, যারা আমাদের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, অধ্যয়ন করতে হবে, খোঁজখবর রাখতে হবে। শিশুর অন্তরে যেন নবিজি (ﷺ)-এর এই হাদীসটি সদা সর্বদা জাগ্রত থাকে। তিনি বলেছেন, ‘পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও হামদরদীর দিকে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মতো। যখন দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমগ্র দেহে অনিদ্রা ও জ্বর অনুভূত হয়।’^[১৪৬] কাজেই যখন অন্যান্য মুসলিমরা আনন্দিত থাকবে তখন আমরা আনন্দ অনুভব করব এবং যখন তারা দুঃখকষ্টে থাকবে তখন আমরা দুঃখিত হবো। যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা তাদের সাধ্যমতো মুসলিমদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং বিদ্যমান অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। মুসলিম সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে তাদের বোঝা উচিত এই সমস্যাগুলো দূরবর্তী বা অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং এগুলো তাদের নিজেদেরই সমস্যা।

‘সামষ্টিক সচেতনতা’ তৈরিতে কিছু ব্যবহারিক উপদেশ

শিশু-কিশোরদের মাসজিদ ও অন্যান্য সামাজিক সম্মেলনে নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তারা অন্যান্য মুসলিম শিশু-কিশোরদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবে। অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিম পরিবারের জন্য এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

[১৪৬] বুখারি : ৬০১১।

৬-৭ বছর বয়স থেকে শুরু করে তাদেরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া উচিত যেখানে তারা বড়দের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। সহজাতভাবেই শিশুরা বড়দের অনুকরণ করবে, সুতরাং তাদের সামনে অনুকরণযোগ্য ‘রোল মডেল’ থাকতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এলে তাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে আসতেন। উদাহরণস্বরূপ, মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামদের একটি দলের সাথে বসে ছিলেন। একব্যক্তির সাথে তার শিশু পুত্র ছিল। সে তাকে পিছন থেকে নিয়ে এসে সামনে বসাত।’^[১৪৭]

শিশু-কিশোরদের মাসজিদে জামাআতে উপস্থিত করতে হবে। এমনকি জানাযার সালাত ও ঈদের জামাআতে পরিবার-সহ উপস্থিত হতে হবে। বিশেষ দিনগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। একত্রে ইফতার ও ঈদ পালন করতে হবে। শিশু-কিশোররা যেন নিজেদেরকে মুসলিম সমাজের অংশ মনে করে সেই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। কোনো কার্যক্রম না থাকলে বয়স ও রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী কার্যক্রম তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বীনি পাঠচক্র আয়োজন করা, কুরআন হিফয করা, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ, খেলাধুলা ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে। এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেন নতুন প্রজন্মের মুসলিমরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। এভাবেই সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে।

এ সকল কার্যক্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং উপদেশ-প্রদানের কালচার গড়ে ওঠে। এভাবে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়।

শেষ-কথা

একজন ব্যক্তি জীবনভর যে আদর্শ ও মূল্যবোধ ধারণ করে বেঁচে থাকে সেটাই তার অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি অন্যান্য সকল বিষয়ের ভিত্তি। আদর্শের ভিত্তিতে একজন মানুষের সকল কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। যেমন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, আচার-আচরণ, সামাজিক লেনদেন, আবেগ-অনুভূতি এবং সর্বোপরি আখিরাতের চূড়ান্ত গন্তব্য। যদি কেউ জীবনভর অমুসলিম থাকে কিন্তু জীবনের শেষভাগে এসে ইসলাম কবুল করে নেয়, তবুও সে মুসলিমদের একজন হয়ে যাবে এবং এভাবে আল্লাহর রহমতে জান্নাতবাসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি জীবনভর নানা রকম ভালো আমল করেও যদি কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তার আমল বিন্দুমাত্র

[১৪৭] নাসায়ি : ২০৮৭, উত্তম সনদে বর্ণিত।

উপকারে আসবে না। এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ইসলামি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির বিশ্বাস, ঈমান, আদর্শ, জীবনের মূল্যবোধ ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝতে পারি।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আকীদার মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বীনের ব্যবহারিক আমলসমূহ শেখানোর পূর্বে তিনি তাদের অন্তরে ঈমান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা নিশ্চিত করেছেন। ফলে তাঁরা এমনভাবে জীবনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন যে—স্বেচ্ছায় ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছেন। ঈমানের একটি নিদর্শন হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শের জন্য দুনিয়ার সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকা।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি—ইসলামি আকীদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ঈমানের রুকনসমূহের উপর। আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসূল, কিতাবসমূহ, বিচার-দিবস তথা আখিরাত ও তাকদীরের উপরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ছয়টি রুকন। দৈনন্দিন নানাবিধ কার্যক্রম ও মিথজ্জিয়ার মাধ্যমে সন্তানদের মন মগজে এই বিশ্বাসগুলো গেঁথে-দেওয়া মুসলিম পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। সব সময় যেন ছোটদের হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে আল্লাহ তাদের প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা এমনকি অনুভূতি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। এই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তারা স্বেচ্ছায় ভালো-মন্দ পৃথক করার যোগ্যতা অর্জন করবে—সেই কাজটাই বেছে নিবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। কষ্ট, ভয়ভীতি বা প্রলোভনেও তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সন্তান-প্রতিপালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের প্রতিটি কাজ এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিশুরা সারা জীবন প্রভাবিত হবে। এই প্রভাবের ব্যাপ্তি দুনিয়া থেকে আখিরাতের অনন্তজীবন পর্যন্ত। শিশুর ঈমানের পরিচর্যা এবং পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সহায়তা আমাদেরকেই প্রদান করতে হবে। এভাবে ইন শা আল্লাহ একদিন আমরা আমাদের সন্তানকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বড় হতে দেখব। সে ইসলামি পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় হবে এবং যেভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা উচিত সেভাবেই ধারণ করবে।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর রহমতে আপনি অবশ্যই একদিন আপনার কষ্টের ফল লাভ করবেন। যেদিন দেখবেন আপনার সন্তান ফুলের মতো বিকশিত হয়েছে, বড় হয়ে আপনার কষ্ট ও প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করছে, সেদিন আপনার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে! আপনার প্রচেষ্টার বরকতে পুরো উম্মাহ শক্তিশালী ও সচল হবে। আর যে পুরস্কার আখিরাতের জন্য জমা রইল সেটা সবকিছুর থেকে উত্তম, সব থেকে দামি!

লেখিকার পরিচিতি

ড. আইশা উটজ হামদান (Aisha Utz Hamdan, সাবেক লরা মেরি হামদান, Laureen Marie Hamdan; জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪, আমেরিকা; মৃত্যু মার্চ, ২০১৯; রিয়াদ, সৌদি আরব) ছিলেন একজন রিভাটেড আমেরিকান মুসলিমাহ ও পাঁচ সন্তানের জননী। ১৯৮৪ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সবশেষ কর্মস্থল ছিল King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences, Riyadh, Saudi Arabia. এখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে ২০১০ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পদে কর্মরত ছিলেন। মুসলিম ভূমিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে তিনি আমেরিকা ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে চলে আসেন এবং এরপর আরব আমিরাতে ও সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মেডিকেল সেন্টারে পেশাগত অবদান রেখেছেন। তিনি Clinical Psychology বিষয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন West Virginia University of Morgantown হতে। American Open University of Falls Church, Virginia হতে ইসলামিক স্টাডিজ এর উপর ব্যাচেলর ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক ইসলামি ম্যাগাজিন আল-জুমুয়াহতে^[১৪৮] বিভিন্ন বিষয়ের উপর শতাধিক আর্টিকেল লিখেছেন। অন্যান্য আরও অনেক অনলাইন মুসলিম লাইফস্টাইল ব্লগ ও প্ল্যাটফর্মে তিনি নিয়মিত আর্টিকেল প্রকাশ করেছেন। তার তিনটি মৌলিক বই হচ্ছে “Nurturing Eeman in Children”, “Psychology from the Islamic Perspective”, “The Prick of a Thorn: Coping with the Trials and Tribulations of Life”. এ ছাড়াও সাইকোলজি এবং ইসলামের উপর বিভিন্ন গ্রন্থে নানা অধ্যায় রচনা করেছেন, বিভিন্ন জার্নালে আর্টিকেল প্রকাশ করেছেন, অনেক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে ইসলামের চিরায়ত শিক্ষার সমন্বয় করেছেন। Journal of Muslim Mental Health এর অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন।^[১৪৯]

[১৪৮] <https://aljumuah.com/author/draishahamdan/>

[১৪৯] আগ্রহী ব্যক্তিগণ বিস্তারিত জীবনী দেখতে পারেন এই লিংকে, (https://spiritualityandhealth.duke.edu/images/pdfs/Aisha_Hamdan.pdf)

তিনি একজন দ্বীনদার মুসলিমা ছিলেন। তার বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে— অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া ও অমুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে পড়ালেখা সত্ত্বেও নিজের মুসলিম পরিচয়ে তিনি হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত ছিলেন না। বরং বিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সক্রিয়ভাবে দাওয়াতি কার্যক্রমে অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, কনফারেন্স ইত্যাদিতে নিয়মিত আর্টিকেল ও পাবলিকেশন প্রকাশ করলেও তিনি নিজের ছবি প্রদান করেননি। *Contemporary Clinical Psychology* (Thomas G. Plante, Wiley Publishers) গ্রন্থের ৪২০ পৃষ্ঠায় ‘একজন সামসময়িক ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্টের উপর আলোকপাত’ অধ্যায়ে ড. আইশা হামদানের পরিচিতি ও আলোচনা উপস্থাপনের পর সংযুক্তিতে লেখা ছিল : Note : A photo of Dr. Hamdan is absent due to religious reasons. It is forbidden in Islam to draw or make pictures of anything with a soul, unless for official or educational purposes. The photo presented here is of the university where she works.

উক্ত গ্রন্থে লেখিকা নিজের বিশেষত্ব বর্ণনা করে বলেছেন,

‘কোনো কারণে আল্লাহ আমার তাকদীরে নির্ধারণ করেছেন যে, আমি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হবো, ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল। আমার মনে পড়ে, তেরো বছর বয়সে স্কুলের একটি ক্যারিয়ার প্রজেক্টে আমি নিজেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে উপস্থাপন করেছিলাম এবং কিছু ছবি অঙ্কন করেছিলাম। মানুষ কীভাবে চিন্তা করে, আবেগ অনুভব করে, কীভাবে আচরণ করে ইত্যাদি বিষয়গুলো—বিশেষত মানুষের বিভিন্ন অস্বাভাবিক আচরণ আমাকে বেশ ভাবাত। প্রথমে আমি চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে আগ্রহী ছিলাম, তবে পরবর্তীকালে আমি অধ্যাপনা ও শিক্ষার্থীদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছি।’

বর্তমানের অনেক মুসলিমরা যখন নিজের পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত তখন লেখিকার দীপ্ত আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করে। একজন খ্যাতিমান অ্যাকাডেমিয়ান হিসেবে বিজ্ঞানের নানা বিষয় অধ্যয়ন করলেও তিনি সর্বদা ইসলামকেই সামনে রেখেছেন। বিজ্ঞানের চোখে ইসলামকে না মেপে, ইসলামের চোখে বিজ্ঞানকে মেপেছেন। অমুসলিম অ্যাকাডেমিয়ানদের সকল থিওরিই তিনি চোখ বন্ধ করে মেনে নেননি, বরং ইসলামের সাথে মিলিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গে ‘*Psychology from the Islamic Perspective*’ গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন,

‘যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশের সেকুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি বিভাগে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পরবর্তীকালে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে গ্রাজুয়েশন করেও আমি কোনো সন্তোষজনক সাইকোলজিকাল থিওরি খুঁজে পাইনি, যা বিস্তারিত ও

নিখুঁতভাবে মানব-মানব প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। যদিও বিভিন্ন সেকুলার সাইকোলজিস্টদের প্রায় আড়াই শতাব্দিক তত্ত্ব আমি অধ্যয়ন করেছি, এর একটিও আমাকে মানব-মানব সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেনি। কিছু পিওরবকে অন্য খিওরির থেকে অধিক আকর্ষণীয় মনে হয়, কিন্তু (ওগুলো পড়ার পর) সব সময় মনে হতো কিছু একটি অনুপস্থিত রয়েছে। খণ্ড খণ্ড এই টুকরোগুলো মিলে একত্রে কোনো ছবি তৈরি করতে পারেনি।

উইল্টেরি ডিগ্রি অর্জনের পর আমি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য খুঁজতে শুরু করলাম। (যদিও পি.এইচ.ডি অর্জনের বহু আগেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি)। শুরুতে এই অনুসন্ধান কিছুটা কঠিন ছিল। কেননা, বিভিন্ন ভ্রান্ত সৃষ্টিবাদী মতামত ও দার্শনিক চিন্তাবাদ থেকে বিশুদ্ধ ইসলামিক সাইকোলজিকে পৃথক করতে হয়েছে। অবশেষে আমি আল্লাহর অনুগ্রহে ইংরেজি ভাষাতে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিশুদ্ধ উৎসের সন্ধান পাই। আমি সেগুলো পড়তে শুরু করি এবং যতই পড়েছি ততই সত্যের আলো উজ্জ্বল হয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি ইসলামি পদ্ধতি কত জটিলতামূলক! অবশেষে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমি যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছি তা ইসলামের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি। ইসলাম সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ চিত্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সরল ব্যাখ্যা প্রদান করে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের গুরুত্ব কিংবা জীবনে কোন বিষয়গুলো প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইত্যাদি সবকিছু ইসলামে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কীভাবে আমরা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, কীভাবে শয়তান থেকে দূরীকৃত রাখতে পারি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে পারি ইত্যাদি আলোচনা ইসলামে রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করা সম্ভব। এই পথে দৃঢ়পদ থাকা সহজ নয়, তবে লক্ষ্য অর্জন করা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে সম্ভব।

তখন আমি ভাবলাম যে আমরা সবকিছুতে নিছক আমাদের জেনেটিক গঠনের ভিত্তিতে নই কিংবা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বা বর্তমান পরিবেশ দ্বারা সার্বপ্রকভাবে নিয়ন্ত্রিত নই, তখন আমার মনে শান্তির সুবাস বয়ে গেল। কিছু ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। সেই স্বাধীন সিদ্ধান্তের অর্থ আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করা, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং রব। তিনি আমাদেরকে হিদায়াত-প্রদর্শন করেছেন। ইসলামের এই পথ হলো এক এবং একমাত্র পথ—যা দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের সুখ-শান্তি প্রদান করতে পারে।

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এক নিরাপদ অভয়ারণ্যে প্রবেশ করে। সেখানে প্রবেশের মাধ্যমে জীবনের নানাবিধ পরীক্ষা, বাধা-বিপত্তি, মানসিক চাপ ও প্রবৃত্তির নিচু কামনা বাসনা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে।

আমি এতদিন যাবৎ পশ্চিমা সেকুলার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষণা পুনরাবৃত্তি করেছি। বর্তমানের বিভিন্ন গবেষণা থেকে একজন ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক সুস্থাস্থ্যের প্রতি এর বহুবিধ গুরুত্ব ও সম্পর্ক রয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের প্রতি বিজ্ঞানীরা যতই আগ্রহী হচ্ছেন ততই নানাবিধ প্রমাণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা নিরাময় ও প্রতিরোধে ধার্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতা অত্যন্ত উপকারী। এ-সকল গবেষণার মাধ্যমে মূলত ইসলামের সত্যতার বিষয়টি নির্দেশিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

‘অচিরেই আমি এদেরকে সর্বত্র আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও যাতে এদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ কুরআন যথার্থ সত্য। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন?’ (সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ৫৩)

ବିଷୟବସ୍ତୁ

Books

Ali, Abdullah Yusuf (1999) *The Meaning Translation and Commentary*, 10th ed. (rev.). Beltsville, MD: Ammana Publications

Al-Ashqar, 'Umar (2002) *The Messengers and the Messages in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House.

Al-Ashqar, 'Umar (2002) *The World of the Noble Angels*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House.

Al-Ashqar, 'Umar (2003) *Belief in Allah*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House.

Al-Ashqar, 'Umar S. (2003) *Divine Will and Predestination*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House.

Darussalam Research Division (2003) *Child Companions Around the Prophet*, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam Publishers and Distributors.

Ibn Kathir, (2000) *Tafsir Ibn Kathir*, vol. 8. Abridged by a group of scholars under supervision of Safi ur-Rahman al-Mubarakpuri, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam Publishers and Distributors.

Ibrahim, E. and Johnson-Davies, D. (1976) *An-Nawawi's Forty Hadith*. Beirut: The Holy Koran Publishing House

Mohamed, Yasien (1991), *Knowledge in Islam and the crisis in Muslim education*, Muslim Education Quarterly, 32-13 ,8.

Al-Mundhiri, Z. A. (2000) *The Translation of the Meanings of Sahih Muslim*, Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors.

Al-Qahtani, Sa'id bin Wahf (2000) Fortress of the Muslim, tr. 'Aqeel Walker, Riyadh: Darussalam.

Saheeh International (1997) The Qur'an: Arabic Text with Corresponding English Meanings, Riyadh, Saudi Arabia: Abul Qasim Publishing House.

Zarabozo, Jamal al-Din (1997) He Came to Teach You Your Religion, Boulder, CO: Al-Basheer Company for Publications and Translations.

Az-Zubaidi, Z. A. (1996) The Translation of the Meanings of Summarized Sahih al-Bukhari, M. M. Khan (Translator). Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors.

Websites

Al-Baatilee, Ahmed ibn 'Abdullah (2006) "Learning Arabic is a Fard (Obligation) on Every Muslim", 30 Jan. 2006. Islamicweb.com.

http://www.islamicnetwork.com/index.php/weblog/comments/learning_arabic_in_an_obligation_fard_on_every_muslim.

Islam Question & Answer.

<http://www.islamqa.com/en/ref/69808>

Muslim Student Association, University of Southern California. Compendium of Muslim Texts, 'Biographies of the Sahabah': http://www.usc.edu/dept/MSA/history/biographies/sahaabah/bio.ABDULLAH_IBN_ABBAS.html

প্যারেন্টিং সম্পর্কে আরও জানতে হলে

Books

Abd al Ati, Hammudah (1977), Family Structure in Islam, Indiana, USA: American Trust Publications.

Abdul Bari, Muhammad (2002), A Guide to Parenting from an Islamic Perspective, London, U.K.: Ta-Ha Publishers Ltd.

Beshir, Ekram and Mohamed Rida (2003), Muslim Teens: Today's Worry, Tomorrow's Hope (A Practical Islamic Parenting Guide, Beltsville, MD: Amana Publications.

Beshir, Ekram and Mohamed Rida (2004), Parenting Skills Based on the Qur'an and Sunnah, Beltsville, MD: Amana Publications.

Hasan, Abdul-Majeed Alee (1998), Islaamic Family Guidelines, Middlesex, U. K.: Message of Islam.

Hasan, Suhaib. (1998) Raising Children in Islam, London, U.K.: Al-Qur'an Society.

Murad, Mahmoud Ridha (1999), Guidelines for Raising Children, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam.

Rahbar, Faramarz bin Muhammad (1994), Raising Children According to Qur'an and Sunnah, Jeddah, Saudi Arabia: Abul Qasim Publishing House.

Tarazi, Norma (1995), The Child in Islam, Indiana, USA: American Trust Publications.

Ulwan, Abd-Allah Nasih (2001), Child Education in Islam, Cairo, Egypt: Dar El Salam

Websites

Effective Islamic Parenting

<http://www.islamic-world.net/papers/parent.htm>

Parent-Child Relationship in Islam

http://www.islamicworld.net/parenting/parenting_page/parent_child_relationship.htm

The Positive and Negative C's of Islamic Parenting

http://www.themodemreligion.com/family/family_c.htm